সিমার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

: প্রাপ্তিস্থান :

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,

কলিকাতা-৭০০০০৯

আমার প্রতিটি অক্ষর-কণিকার জন্য
যাকে রাত জাগতে হয়—
সাহানা-কে

সূচী

সিমার

এক

সুখবাসের বুকে একটিও লোম নাই। লোহা দিয়ে ঢালাই করা তবিয়ত। ইস্পাতে ঘাস গজায় না। সুখবাসের বুকে লোম গজানোর নরম ভেজা শ্যামলী মৃত্তিকা খোদা দেয়নি। সুখবাসের বুকখানাই বুঝি বা এক ঊষর কারবালা। হেথায় সিমার এক আশ্চর্য অধিপতি। এই বুকের ইস্পাত-নগরীতে বাজার বসিয়েছে সিমার। ভাবলে, সুখবাসের বুক ভেঙে যায়। মুসলমান বলে, সিমারের বুকে লোম ছিলনা। সিমারই তো কারবালার হোসেনকে পানির বদলে উপুড় ক'রে পিঠে চেপে জবাই করেছিল। 'এ কেমন কাফেরের দেশ গো/জহর মিলে পানি মিলে না।' সেই সিমার। জারিগান সারিগান। সর্বত্র সিমারের কথা আছে। এক ফোঁটা পানির জন্য কাতরাচ্ছে বুকের শিশু। এক আঁজলা জল। হোসেনের কণ্ঠনালি শুকিয়ে গিয়েছে। এজিদ সেই পানির বদলে অস্ত্র হাতে সিমারকে হোসেনের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারও বুকে একটিও লোম নেই। কী নির্মম ! কী নিষ্ঠুর ! কী দযাহীন বুকখানা ! সুখবাস আপন বুকের দিকে চেয়ে চেয়ে বিচার করেছে, তবে কি সে সিমারই বটে ? সুখবাসের ভরা যৌবনের সূচনা তখন। লম্বাচওড়া এক দানব যেন বা। হাতের পেশি ব্যায়াম-করা বীরদের মতন শক্ত, উদ্ধত, ফুল্ল। পা দু'খানি বটবৃক্ষের কাণ্ডের মতন মাটিতে খাড়া, দৃঢ়। পায়ের পাতা থেঁৎলো, ছড়ানো, ভরাট। পায়ের ছাপ পড়ে ধুলোয়, যেন জন্তুর দাগ। মানুষের মাপে মেলে না। পায়ের মাপে জুতো মেলা ভার। দোকানে কেনা যায় না। মাপ কষে মুচিকে দিয়ে বানাতে হয়। আর গেঞ্জি ? ইঞ্চি কত ? মাপের বাইরে ফেটে পড়ছে বুক। সর্বনাশ ! একি মানুষ ?

সুখবাস হা হা ক'রে হেসে ফেলে। ভাবে, তার গায়ে যদি ভালুক-লোম থাকত, তবে লোকে তাকে আদম বলে সম্মান করত। কারণ আদম হল পৃথিবীর প্রথম নবী। মুসলমান বলে, আদম আলাহে ছালাম। নবী। পয়গম্বর। আর সে কিনা সিমার ?

দাদীমা তার বুকে হাত বুলিয়ে বলেছিল—চুল কৈ বাছা ! হায় পাপী ! সিমারের বংশ রে সুখবাস। বড়ই নিদয়া।

আঠারো বছরের কিশোর আঠাশ বছরের যুবকের মতন তাগড়া। গোঁফ গজিয়ে যাচ্ছে, বুকে রোম নেই। পায়ে চুলের কালিমা। বুক একেবারে শুদ্ধ। ফাঁকা। সাদা। পাপের রঙ কি সাদা ? পাপের রঙ কি শূন্য ? খালি ? সুখবাস কেঁদে ফেলে। চোখে চিকচিক করে জল। দাদীমা তাকে ঘৃণা আর ভয় করছে। দেশবাসীও সিমার বলে ডাকে। সুখবাস নামটা তলিয়ে যায়।

আসলে সুখবাসের বিয়ের বয়স হয় তখন। বাপ জানে, সুখবাস ছেলেমানুষ। গায়ে গোস্তে বাড়ন্ত বলে পুরুষ মনে হয়। দাদীমা বলল—পরহেজগার মেয়ে আনবে ঘরে। পুণ্যবতী। ঋতুমতী। ঠাণ্ডা।

বিয়ের কথা চলছে। সুখবাসের মনে সুখ নাই। সারাদিন কোথায় কোথায় পালিয়ে ফেরে। একদিন দুপুরবেলা বাড়ি ফিরেই দাদীর কাছে মাথা নিচু ক'রে বসল। দাদীমা শুধাল—কোথায় ছিলি সারাদিন ?

সুখবাস মৃদু উচ্চারণ করল—ঘোড়া। গরু। মোষ।

দাদীমা খলখল ক'রে হেসে ফেলল। বলল—বুঝেছি। কার ঘোড়া ?

—লেবাসতুল্লার ঘোড়া। বরকতের গরু। চাহারুদ্দির মোষ।

—ভালো কথা। ক'টাকা দিয়েছে ?

—চাট্টাকা ক'রে আট। আর ঘোড়ার দশ।

—নেকাপড়া শিকেয় তুললি বাপ। জন্তু ফিরিয়ে বেড়ালি। মানুষ হলি নে।

—কী হবে মানুষ হয়ে, আমি তো সিমার। পাপী। তুমিই বুলেছ।

—হ্যাঁ। ঠাট্টা করেছি বাপ রে। মুসলমান কি সিমার হয় ?

—হয়। লিশ্চয় হয়।

সুখবাস ডুকরে উঠল। বলল—স্কুলের ফার্সি-স্যার সাদেক মৌলবী আমাকে বুলে দামড়া। মুখের ভাষাব ভুল ধরে। 'কালাপাহাড়', 'সিমার' বুলে গাল দেয়। জামা তুলে সকলকে দেখায় বুকে চুল নাই। সবখানে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে, আমি খারাপ। আমি যাব না। এইট অব্দি ঠেলে ঠুলে গিয়েছি, ওতেই চোখমুখ হয়েছে। আর না।

দাদী সমর্থন করে—তাই হবে। যাস না।

সুখবাস বলে—গরু মোষ ফিরাবো। ঘোড়া তাঁবে করব। মাটি চষবো। মুনিশ খাটব। আমার কাম। মুসলমানের নেকাপড়া মক্তবী নেকাপড়া। আমপারা পড়ব। কুরান পড়ব। তা লয়, গিয়েছি সিমারী করতে। ইসকুলের নেকাপড়ায় খুদা নাই। বেহেস্ত দুযখ নাই। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে। সব ছাত্র

আমার হাঁটুর বয়েসী। আমি যেন একটা ফেউ। পেছনে লাগে মাস্টার অব্দি। শালা বুকের বুতাম খুলে···

হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেলে সুখবাস। সুখবাসেব গায়ে হাত বুলিয়ে দাদী বলে—শাদী কর্ বাছা। ধম্মে মতি হবে।

সেকথা কানে গেল না সুখবাসেব। হঠাৎ ক'রে বলে উঠল---আচ্ছা দাদী! মেয়েমানুষের বুকেও তো চুল থাকে না।

দাদী ম্লান হেসে জবাব করল—তারা যে মায়ার জিনিস ধন, মায়াবতী। সিমার যে পুরুষ। একটু দম ফেলে দাদী ফের বলল—বউকে ভালোবাসলে খুদা তোর বুকে দযামাযা দিবে। তুই সিমার, সেডা ভাবি মিছে কথা সুখবাস!

সুখবাস দাদীর কোলে মুখ গুঁজে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমাকে তুই মুসলমান ক'রে দে দাদী! বড় কষ্ট দাদী। খুব কষ্ট আমার!

নামাজ শিক্ষা শুরু হল সুখবাসেব। মক্তব মাদ্রাসা যেতে শুরু করল। ভালো মতন মুখস্ত হয় না। খানিক মুখে আসে তো বাকি ভাগ পেটে থেকে যায়। আগায় পড়ে তো গোড়া ভুলে যায়। একদিন সে লক্ষ করল, ইসকুলের ফেলমারা কমবুদ্ধির ছেলেগুলো সব একে একে মক্তব মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। মাথা-অলারা সহজে মক্তব-মুখো হয় না। ভালো মাথা দু'একটি যে না থাকে তা নয়। খুব গরিব বলে হাইস্কুল যেতে পারেনি। তারপর আস্তে আস্তে কোরান হাদীস ভালোবেসে আপন কউম (গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়)—এর মুখ উজালা করে! তখন কারো কারো চোখে মুখে নূরের আলো পাকপবিত্র ঢেউ তুলে মানুষকে ফেরেস্তার মতন দামী মানুষ ক'রে দেয়। সেই শোভা দেখলে মনে হয়, আবে জমজমে গোছল হয়ে গেল। সত্যিই হয়।

তাহের সাহেব কারী। কোরান খুব সুন্দর ক'রে সুরে পড়ল। তাঁকে গায়ের জামা খুলে সুখবাস দেখালে—দেখুন, কারী সাহেব, আমি সিমার? বুলেন? সবাই মিথ্যুক কিনা বুলেন?

প্রাণ-খোলা হাসি হাসেন কারী। তারপর বলেন—বুকখানা সিমারের মতন বটে, মুখখানা তো নয়। হায় বাপ! আজও ফাতেহা সুরা মুখস্ত হল না তোর!

তারপর কেমন রহস্য ক'রে কানের কাছে মুখ এনে সুখবাসকে বলেন—কে তুমি বটে! আই ডোন্ট নো। হাঃ হাঃ হাঃ!

কারীর দু'একটি চমৎকার ইংরেজি বলার স্বভাব আছে। সুখবাস বুঝল, মুসলিম দুনিয়ায় সে যে কে, সেই ধন্দের সাফ জবাব কেউ দেবে না।

কারী আরো দু'দিন বাদে বললেন—মক্তবে দারুণ রাজনীতি চলছে সুখবাস। দেশে লোক দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। ভেরি কমপ্লিকেটেড অবস্থা। তুই কোন পক্ষে

খুদা মালুম। সিমার বললে দোষ, নাকি না বললে দোষ বুঝতে পারছি না।

সুখবাস বাড়ি ফেরে। ফিরেই শুনতে পায় তার বিয়ের কথা চলছে। বাপ-চাচারা আসর ক'রে আলোচনা চালাচ্ছে। মগরাহাটের মৌলবী গিয়াসজীর মেয়ে জাহেদা সেই বিয়ের কনে। গিয়াসজী মক্তবের মৌলবী এখন। ভদ্রলোক বিপত্নীক। একমাত্র সন্তান জাহেদাকে সঙ্গে ক'রে পাঁচ বছর আগে তিনি সুখডহরি আসেন। সঙ্গে আসে ১১/১২ বছরের অনাথ দরিদ্র ভাইপো ঈশা। ঐ মাদ্রাসারই তালবিলিম। থাকে পাশের গাঁ সুখানটি। ইব্রাহিম আনসারীর বাড়ি। জায়গীর। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মাদ্রাসায় আসে। যাই হোক। খুব বড় পাশ-করা মৌলবী গিয়াসজী নয়। কিন্তু পড়ানোর সুনাম যথেষ্ট। সমস্যা হয়েছে তাঁকে নিয়েই। মক্তবকে সরকারী মঞ্জুরি পাইয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় উন্নীত করানোর একটা গোপন তদারক তদ্বির চলছে। কিছুকাল যাবৎ। মক্তবের যিনি সেক্রেটারি, সইফুল্লা মণ্ডল, তাঁর ইচ্ছে সদ্য বিয়ে হওয়া এবং এফ· এম· পাশ জামাই কুদ্দুস মাদ্রাসায় ঢুকে যাক। তা করতে গেলে গিয়াসজীকে সরিয়ে দিয়ে সেই শূন্যপদে কুদ্দুসকে বসাতে হবে। গিয়াসজী অবশ্য এফ· এম· পাশ করা মৌলবীই। কুদ্দুস এখনো পড়াশুনা করছে, আরো বড় ডিপ্লোমা সে শিগগির যোগাড় করবে ইনশাল্লাহ। সেকথা সেক্রেটারি পাঁচ মুখে প্রচার ক'রে যাচ্ছে দীর্ঘদিন। তাছাড়া কুদ্দুস বি· এ· পার্টওয়া· পাশ ক'রে উত্তর প্রদেশে আরবী দীনিয়াতী শিক্ষা করতে গিয়েছিল। গিয়াসজী ম্যাট্রিক পাশ করেননি। অতএব কুদ্দুসকেই কমিটির রেজলিউশন করিয়ে শিক্ষকের পদে নিয়োগ করা সমীচীন। মাদ্রাসার বয়স নয় বছর। পাঁচ বছর যাবত সামান্য বেতনে (জনসাধারণের কাছে সংগৃহীত অর্থ থেকে দেয়) গিয়াসজী মাদ্রাসা চালাচ্ছেন। সংগঠক মৌলবী তিনি, তাঁকে বাদ দিয়ে ধর্মস্থান না-পাক হয় নাকি ? তাতে যদি মাদ্রাসা মঞ্জুরি না পায়, দেশের লোক যেমন এতদিন টাকাপয়সা গম ধান পাট দিয়ে মাদ্রাসা চালিয়ে আসছে, তাই চালাবে। মক্তব যদি মক্তবই থাকে, মাদ্রাসা না হয়, তবু ভালো। গিয়াসজীকে বাদ দেওয়া চলবে না।

দুই বিপরীত নীতি চর্চার ফলে জনগণ দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। কুদ্দুসের নিয়োগ যে মাদ্রাসার উন্নতির কতবড় সহায়ক একপক্ষ তা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। তারা গিয়াসজীকে ভালোবেসে ফেলেছে। নবীর ঘরে স্বজন পোষণের চালিয়াতি স্বার্থপরতা লোকে বুঝে ফেলেছে বটে, কিন্তু সেক্রেটারির তাঁবেদার গোষ্ঠিও কম জিন্দা নয়। মাদ্রাসার ঘণ্টা বাজানোর পিয়নী চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে সইফুল্লা গাঁয়ের একজন মোল্লাকে কাৎ করেছেন। তার, সেই মোল্লার গুষ্টি খুব বর্ধিষ্ণু আর সতর্ক আর মালদার। কেবল সেই মোল্লা সোভানী খতিবই দরিদ্র।

ফলে মক্তব এখন চাপা অসন্তোষের জিম্মায় ভাসছে। একটা কিছু ঘটবে। সামনে মক্তব ইন্‌সপেকশন হবে।

এই অবস্থায় সুখবাসের বিয়ের কথা উঠল। গিয়াসজী রাজি হয়েছেন। জাহেদার বয়স এগারো বছর। রোগা পাতলা গড়ন, কিন্তু মুখশ্রী অপূর্ব। ভয়ানক মিষ্টি আদল। কাঁচা সোনার রঙ। মক্তবে পড়ে। বাপের সঙ্গে থাকে। তার একটা হিল্লে দরকার ছিল। গিয়াসজীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কারণেও সুখডহরিতেই বড় গুষ্টি দেখে মেয়ের শাদী দেওয়া এই মুহূর্তে জরুরি হয়ে উঠল। নইলে তাঁর চাকরি থাকে কিনা সন্দেহ। সুখবাসের গুষ্টি গিয়াসজীর হয়ে লড়বে। দরকার হলে লাঠি অব্দি চলবে। তাই বেশ। কথা কি বুঝলে সুখবাস ?

সুখবাস বাপ-চাচার আলোচনা শুনতে শুনতে অনুভব করছিল, তার বুকের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে। জাহেদাব নরম ভেজা হাসিখুশি মুখখানা মনে পড়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে অসহায় গিয়াসজীর মুখটাও মনের ভেতর ভেসে উঠছে। গিয়াসজীর বয়েস হয়েছে। জাহেদা তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি বউই কপাল গুণে টেঁকেনি। মরে গিয়েছে। প্রথম বউয়েরও একটি মেয়ে আছে শোনা যায়। বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘর করছে। দীর্ঘদিন পর গিয়াসজী দ্বিতীয় বিয়ে করেন, তারই মেয়ে জাহেদা।

জাহেদার জন্মের চার বছর পর দ্বিতীয় বউ মারা যায়। বউয়েব মৃত্যুর দু'বছর বাদে গিয়াসজী মেয়েকে সঙ্গে ক'রে সুখডহরি চলে আসেন। মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি সুখডহরিতেই স্থায়ী বসবাস করবেন এমন বাসনার কথা সুখডহরির সকলেই জানে। মগরাহাট ফিরে যাওয়ার কোনো চাহিদা গিয়াসজীর নেই। মগরাহাটে সামান্য জমি জিরাত আছে, সেইসব বিক্রী ক'রে দিয়ে তিনি সুখডহরিতেই থেকে যাবেন। কেউ যদি দয়া ক'রে বয়স্থা কোনো মেয়ের সঙ্গে গিয়াসজীর নিকে দেয়, সেই ব্যাপারেও মৌলবীর কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হয় না। সুখবাসদের গুষ্টি মধ্যেই তেমন স্বামী পরিত্যক্তা রাড়ী (বিধবা) মেয়ের সন্ধান আছে। সেইসব কথাবার্তাও উঠছে ক্রমশ।

সুখবাস মনে মনে গিয়াসজীর দামাদ হয়ে গিয়েছে এই মুহূর্তে। সকলেই যখন আলোচনায় মশগুল সুখবাস তখন ছোট ভাবীর ঘরে ঢুকে পকেট ট্রানজিসটরখান টেবিল থেকে উঠিয়ে নেয়। গতবছর অগ্রজ ছোটভাইজান আরিফতের বিয়ে হয়েছে, ওর বুকে অনেক চুল আছে। ছোট বউ বড়ই রসিকা, চোখে ঠমক দিয়ে হাসে। সেই হাসি দেখে সুখবাস লজ্জা পায়। ঘর থেকে এক লাফে উঠোনে নেমে আসে। পেছন থেকে খিলখিল হাসি। পথে পালিয়ে আসে সুখবাস। ট্রানজিসটর খুলে দেয়। জোরে দম বাড়িয়ে দিয়ে কানে চেপে ধরে। রেডিও

গাইছে :

আকাশের মিটিমিটি তারার সাথে
কইব কথা।
নাইবা তুমি এলে।

গান শুনতে শুনতে এগিয়ে চলে সুখবাস। আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ ঝুলছে, জ্যোৎস্নায় প্লাবিত পথ। কেমন নেশা জেগে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সুখবাস মক্তবের কাছে চলে আসে। বিরাট বাড়ি। লম্বা দোতলা। মক্তবের নিচের তলা বহিরাগত তালবিলিম (ছাত্র) আর মৌলবী মৌলানায় পূর্ণ। নিচের তলায় বাস। উপর তলায় পড়াশুনো। সকাল সাড়ে নয়টা অব্দি ক্লাস চলে। শতকরা সত্তর ভাগ মেয়ে, তিরিশ ভাগ ছেলে। এইসব ছাত্রছাত্রীর চল্লিশ ভাগ দশটার পর স্থানীয় জুনিয়র হাইস্কুলে সাধারণ শিক্ষার জন্য পড়তে যায়। ফলে মক্তব মর্নিং। হাইস্কুল ডে। এইভাবে চলছে। বাকি ষাট ভাগ মক্তব ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষা নেয় না। যাই হোক, মক্তবের কাছে চলে আসে সুখবাস। আজ তার এশা (মধ্যরাত্রির আগের নামাজ) পড়া হয়নি এখনো।

এখন রাত সাড়ে দশটা। পথ নির্জন। হঠাৎ মক্তবের নিচের তলার ঘর থেকে সোভানী খতিবের কড়া ধমক শুনতে পায় সুখবাস। খতিব মৌলবীদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আড্ডা (হাদীসী আড্ডা) দিচ্ছে। তাহাজুদ (মধ্যরাত্রির নামাজ) পড়বে মসজিদে গিয়ে, তারপর কোনোদিন বাড়ি ফেরে, নয়ত মসজিদেই শুয়ে যায়। খতিব গর্জন ক'রে ওঠে—রেডিও থামাও সুখবাস। জ্যোৎস্নায় সুখবাসকে চিনে ফেলেছে খতিব। রাগে গরগর করছে। বলছে—তুমি মুসলমানের ছেলে, তালবিলিম। মাদ্রাসার (যদিও আসলে মক্তব) পাশ দিয়ে নোংরা গান বাজিয়ে যাও, ভয় করে না ? এভাবে গান শুনলে চল্লিশ বছরের এবাদত (উপাসনা) নষ্ট হয়, জানো না ? এজিদের বংশ নইলে এই শখ কার হবে, আসলে যে সিমার। হাতে পাওয়ার থাকলে মাদ্রাসায় ঢুকতে দিতাম না। ছিঃ।

সশব্দে জানালা বন্ধ হয়। রেডিও থেমে যায়। সুখবাসের মনে হয়, বুকের মধ্যে কেউ নিশ্চয় বসে আছে। বন্দী হয়ে আছে। আপন মনে গানটা শুনছিল। রেডিও-য় সুখবাস নব ঘুরিয়ে যায়। আরব থেকে আরবী কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে না। ঢাকা থেকে নাতে রছুল বা খোদাকে হম্‌দ্ শোনা যায় না। হঠাৎ কেন যেন তার খতিবের গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে। নিজেকে এখন তার সিমারই মনে হয়। খুব দ্রুত সে বাড়ি ফিরে নামাজে দাঁড়ায়। তাবত গা থরথর ক'রে কাঁপে। যেন জ্বর এসে গিয়েছে।

বিয়ের রাত। মনে পড়ছে সন্ধ্যাবেলা উঠোনে পাশাপাশি দু'টি চেয়ারে

বর-কনে বসেছে। মিঠাই শরবত পানি খাওয়ানো হচ্ছে। একটা ছোট রসগোল্লার আধখানা বরকে খাইয়ে বাকি ভাগ জাহেদার মুখে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাঁকা চোখে সুখবাসকে দেখছে জাহেদা। কাপড়ে জড়ানো কিশোরীকে কলাবউয়ের মতন দেখাচ্ছে। সুখবাস কালো পশমের কিস্তিটুপি, সাদা ইস্তিরিবিহীন পা-জামা জামা পরেছে। বাংলাদেশি জাপানি টেরিকটন। পায়ে জাফরি ফিতে চামড়ার স্যাণ্ডেল আর ধলো মোজার তলায় ধুলোর দাগ। মুখে গন্ধীরুমাল, মুখে ঘামতেলের মতন হিমানী। এঁটোজল খাওয়ানো হচ্ছে কনেকে। গিয়াসজী সুখবাসের হাতে মেয়েকে সঁপে দিচ্ছেন। খাইয়ে না-খাইয়ে এতদিন সাথে ক'রে আগলে রেখেছি। মানুষ করতে পারিনি। তবে মেয়ে আমার দশ পারা কুরান কণ্ঠস্থ করেছে। তার দেহ পবিত্র। তার যেন অসম্মান না হয় সুখবাস বাবাজীবন। জাহেদার নিঃশ্বাসে ফেরেস্তার গায়ের গন্ধ পাবে বাপজী। কখনো কোনো যাতনা দিও না। আদর দিয়ে মুহব্বত দিয়ে সুখি করবে, তার বেশি কামনা করি না। তার জীবনমরণ তোমার হাতে। তার ভালোমন্দ তোমারই হাতে। তোমারই পায়ের তলায় তার জান্নাত (স্বর্গ)। মা জাহেদা, সুখবাসই তোমার সব মা। ইহকাল পরকালের সাথী। সুখদুঃখের শরীক। স্বামীর কথা কখনো অমান্য কোরো না। যখন যা চাইবে, সাথে সাথে পালন করবে। যত কষ্টই হোক, কোনো কিছুতেই না বলবে না। (হাদীসে আছে উটের পিঠে যেতে যেতে স্বামীর যদি কামনা জাগে, স্ত্রী তা সেই উটের পিঠেই নিবৃত্ত করবে।) কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না গিয়াসজী। আটকে গেল। কেন না জাহেদার এখনো সারা বুকে স্ফুট পূর্ণিমা আসেনি। হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) হয়নি। কাঁচা নরম গা। হাড়গুলো পুরোপুরি শক্ত হয়নি। এসব কথাও তো বলতে হয়। বলতে পারেন না তিনি। কারণ তিনি পিতা। চুপ ক'রে থাকেন। কিছুক্ষণ পর ফের বলে যেতে থাকেন—যখন যা চাইবে দিতে হবে। তার সমস্ত ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা। তার ভালো লাগাই তোমার ভালো লাগা। তার দেহই তোমার দেহ। তার মনই তোমার মন। এক আত্মা, এক প্রাণ। আর তোমাদের সুখেই আমাদের সুখ। থেমে পড়লেন মৌলবী। অস্ফুট ডুকরে উঠল কণ্ঠস্বর। সেইদিকে চেয়ে রাড়ী বেওয়া নাদিরার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। তিনি বারান্দায় মেয়েদের জটলায় দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। সুখবাসের ফুপু।

বিয়ের রাত। বর কনে এক ঘরে শুয়েছে। বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েছে কে বা কারা। মধ্যরাত্রে কেমন একটা আর্ত মেয়েলি স্বর উচ্চকিত হয়ে থেমে যায়। কেউ কিছু বুঝতে পারে না। মা চাচী আর বউরা এসে সুখবাসকে নরম ক'রে ডাকে। কোনো সাড়া পায় না। সব নিঃশব্দ। হঠাৎ কিঞ্চিৎ

ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ। মেয়েরা পরস্পর চোখে চোখে চেয়ে লজ্জা পায়। বাইরের শেকল নামিয়ে দিয়ে তারপর ঘাড় নিচু ক'রে আপন আপন ঘরে ফেরে। ভোর হয়। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে সুখবাস। বারান্দার মেঝেয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। চোখমুখ ফুলো ফুলো। লাল রক্তজবার মতন চোখ। পরনের সাদা লুঙ্গিতে রক্ত লেগে আছে। বাড়ির সবাই সুখবাসের ঘরে জড়ো হয়। জাহেদার মুখের মধ্যে ঠেসে ঠেসে কাপড়ের আঁচল ঢোকানো। তাবত বিছানা রক্ত মাখা। জাহেদা মৃত। মুখের ভেতর থেকে কাপড় টেনে বার করা হয়। চোখ দু'টি খোলা। হিম। স্থির।

দুপুর নাগাদ জাহেদার কাফন হয়। গোর হয়। তারপর সইফুল্লার হেফাজতে পুলিশ আসে। সুখবাসের বাপের কাছে ঘুষ খেয়ে পুলিশ ফিরে যায়। পুলিশ যখন গিয়াসজীর কাছে ঘটনা জানতে চায়, গিয়াসজী চুপ ক'রে থাকেন। পীড়াপীড়ির ফলে কেবলই বলেন—সবই নসীব দারোগা বাবু। জানি না কী ঘটেছে। কেউ কি বিয়ের রাতে ইচ্ছে ক'রে বউ মারে! ওরা দু'জনেই যে ছেলেমানুষ।

তাবত গাঁয়ে মৃদু উত্তেজনা হয়। পুলিশ ফিবে গেছে শুনে উত্তেজনা গাঢ় হয়। কিন্তু গিয়াসজীর নীরবতা সকলকে ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে ক্রমশ নিরুচ্চার ক'রে দিতে থাকে।

সেইদিন বিকালে সুখবাস রতন নন্দীর বাড়ি এসে বলে—দ্যান নন্দীবাবু ঘোড়াখানা, ফিরিয়ে (বশ মানানোর ট্রেনিং) দিই। লাগাম পরাই। তারপর সুখবাস লাফিয়ে ওঠে ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া ছুটে যায় শিলাডিহির জঙ্গল বরাবর। সন্ধ্যা নেমে আসে। জঙ্গলে ছুটতে গিয়ে লতার জটে গাছের কাণ্ডে ধাক্কা খেয়ে সুখবাস ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ঘোড়া তখন ছুটে যায় অন্য দিকে। অন্ধকার নিবিড় নয়। কেননা আকাশে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু পাতায় ডালে আচ্ছন্ন জঙ্গলের আকাশ। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার উঁকি ঝুঁকি। মাটিতে পাতার আস্তরণ। জ্যোৎস্না আর অন্ধকারের মিলিমিশি ভাব। সুখবাস ঘোড়া খুঁজতে থাকে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তার নিজের পায়ে শুকনো পাতার শব্দ শোনে। ঘোড়ার সাথে সারারাত তার লুকোচুরি চলে। শব্দ শোনে। ঘোড়া পায় না। তারপর সে ক্লান্ত হয়ে একটি আমগাছের গোড়ায় চুপচাপ বসে। গা এলিয়ে শুয়ে যায়। ঘুম আসে। রাত্রি অতিবাহিত হতে থাকে। চাঁদ ডুবে যায়। তখনো অন্ধকার থাকে। মৃদু শীত পড়ে। হাওয়া বয়। ক্রমশ পুব আকাশ ও অরণ্য ফিকে আঁধারে অদ্ভুত স্তব্ধ হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে ঘোড়াটা সুখবাসের কাছে ফেরে। সুখবাস তখনো ঘুমন্ত। ঘোড়া সুখবাসের

গায়ে মুখ ঠেকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে। হিম উষ্ণ মুখ। সুখবাসেব ঘুমন্ত গা শিবশিব ক'বে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায। হঠাৎ ঘোড়াব ছায়া দেখে আঁৎকে ওঠে। ঘোড়াটাকে আশ্চর্য ভয কবে তাব। মনে হয এ ঠিক ঘোড়া নয। জাহেদা। জাহেদাব মৃত্যু। সেই মৃত্যুব এক প্রবল আকৃতি। সুখ... । স্পর্শে জাহেদা এই ধাবা সিঁটিয়ে আঁৎকে বলেছিল—হায খুদা খুদাবন্দ।

দুই

লজ্জায আব মক্তবে যেতে পাবে না সুখবাস। ঘটনাব পব একদিন মাত্র গিয়েছিল। মৌলবীবাবা খুব ভালো ক'বে কথা বলেননি। ছাত্রছাত্রীবা কেমন চোখ বড বড ক'বে তাকে দেখছিল।

ববং গিযাসজী তাকে কাছে ডেকে পডা বুঝিযে দিযেছিলেন। ভালো ব্যবহাব কবেছিলেন। বলেছিলেন—মন দিয়ে পডাশুনো ক'বে পবহেজগাব হও। খোদাভীরু হও। ইমাম হও। ভালো মওলানা হও। যদি কোনো বদি (পাপ) ক'বে থাকো খোদাব কাছে মাফ চাও। কাঁদো। ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুখবাস লক্ষ কবছিল, মুসলমানেব জামাতে তাব স্থান ক্রমশ সংকুচিত হযে আসছে। কিছুদিন সেই ধাবা মনে হলেও ক্রমশ সুখবাস টেব পাচ্ছিল তাব দুর্ঘটনাব কথা লোকে ভুলে যাচ্ছে। জাহেদা এক তুচ্ছ জীব। অমন মৃত্যু কখনো ঘটে না এমন নয। বন্ধুদেব সে গোপনে শুধিযে দেখেছে, কমবযসী বউবা স্বামীব ভযেই বিযেব পব কিছুদিন বাপেব ঘব পালিযে বেড়ায। গাঁযেব বাস্তায কত কচি মেযেকে চুপচাপ পালিযে যেতে দেখেছে তাবা।

যাই হোক। সাত মাস বাদে সুখবাসেব দ্বিতীয বিযে হয। দাদীমা বলেছিল, তাজা মেযে এনো। তাগডা জাহাঁবাজ মেযে এনো। পুরুষ্ট গোলগাল মেযে এনো। যুবতী মেযে এনো।

দাদী মাযেব কথা অক্ষবে অক্ষবে মান্য কবা হযেছিল। মদিনা ছিল জাহাঁবাজ মেযে। তাগডা। তাজা। পুরুষ্ট আব ভযানক যুবতী। মদিনাব বাপ ছিল গামছা-বোনা জোলা। ভীষণ দবিদ্র। গাঁযে গামছা বিক্রি কবতে এসে সুখবাসেব বাপ-চাচাব সাথে বিযেব কথা পাকা হয। লোকটি ভালোমানুষ। সুখবাসকে ঘৃণা কবেনি। কাবণ দবিদ্রবা ভালোমানুষই হয়। যথাতথা ঘৃণা কবে না। তাছাড়া মেয়ের বাপকে নাক উঁচু করলে চলে না। অতএব বিযে হয়ে গিযেছিল।

বিযেব রাত। তখন গবম কাল। বাসব ঘরে ঢোকাব আগে বাবান্দায জামা কাপড খুলে হাওযা খাচ্ছিল সুখবাস। এক ফাঁকে নামাজ পড়ে নিয়েছিল।

তারপর ঘাড়ে জামা ফেলে ঘরে ঢুকেছিল। সুখবাসের খালি গা, ফাঁকা বুক দেখে চমকে উঠেছিল মদিনা। একটিও রোম নেই। ভয়ানক খালি। ঘন হয়ে কাছে এগিয়ে যেতেই মদিনা সুখবাসের বুকে হাত রেখে ককিয়ে উঠেছিল—লোকে বলে তুমি সিমার। আমার বেহাল কোরো না। মেরো না। পাষাণের তলায় পানি থাকে। আমি জানি। আমি ভালোবাসব তোমাকে। ঘেন্না করব না। সিমারও তো মুসলমান।...তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো ?

সুখবাস কথা বলতে পারছিল না। সিমারও যে মুসলমান এ-কথা সে প্রথম শুনল। শুনল পাষাণের তলায় পানি থাকে। এবং ভালোবাসার কথা প্রথম এক নারীকণ্ঠে শুনতে পেল। আজ অব্দি সে কারুকে তাব পাপের কথা বলতে পারেনি। ভেবেছে তার কথা কেউ শুনবে না। ঘৃণা করবে। সুখবাসের বুকের ভেতরটা কেমন এক ভয়ে আনন্দে কাঁপছিল। বলল—আমি সিমার ঠিক কথা মদিনা। লোকের বচন আমাকে সিমারই করেছে। আমি জাহেদার মুখে কাপুড় ঠেসে দিনু, কী একটা যে ভর করল গায়ে। একিন হয় তুমার ? লরম পাখির পারা মেয়েলোকের পরাণ আমি ঠুকরে খেয়েছি, হায় গো ! একিন হয় মদিনা ? কাপুড় ঠেসে দিনু আর...

মদিনা বলল—হয়। তারপর সুখবাসের বুকে আঙুলেব তুলিতে লিখল আলিফ লাম মিম। দু'টি চোখে তার প্রগাঢ় ভালোবাসার ঘনতা ঠিকরে ওঠে। বলল—দম আটকে গেল জাহেদার ?

সুখবাস সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়—না না। তা লয়। তেমুন তো লয় গো। দম আটকেছে ভেন্ন জুলুমে। সে কথা বুলা যাবে না বউ। রক্তে ভেসে গেয়েছে জাহেদা। পাপের লোহু। হায় হায় !

বুকের উপর থেকে মদিনার হাত মৃদু ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সুখবাস আপন বুকে সজোরে কিল মারতে থাকে। বুকের মধ্যে কে যেন তার হায় হুসেন হায় হুসেন করছে। সান্ত্বনাহীন আর্তনাদ করছে। হোসেন (বা হুসেন)-কে হারিয়ে যেমন ক'রে মুসলমান কাঁদে। শিয়ারা শোক পালনের ব্রতে মরিয়া হয় কারবালার যুদ্ধের স্মৃতি-উৎসবে মহরমের দিন। এ যেন তেমনি পাগল।

সুখবাস বলে—আমি জাহেদার বদনখানা কিছুতেই মুনে আনতে পারি না মদিনা। পারি ন্যা ! কেমুন ছিল পাক-সুরত তোকে বুঝাব কেমনে বউ ! আবার বুকে ঘুসি আছড়ে ফেলে। সিজদার মতন বালিশে মাথা রেখে ছটফটিয়ে কেমন মাথার চাপে ঘষটে ঘষটে বালিশ দলিত করে। তারপর সে ভয়ের কথা বলতে শুরু করে। নন্দীর ঘোড়ার কথা। অরণ্যে ঘোড়া হারিয়ে যাওয়ার কথা। তারপর গা চেটে দেওয়ার কথা। পাতার শব্দ। চাঁদ। অন্ধকার। শিরশিরে হাওয়া।

ঘোড়ার জিহ্বায় মৃত্যুর স্বাদ। যেন জাহেদাই ফিরে এসেছে। বা ভয়ংকর কেউ। ঘোড়া তীব্র চিৎকার করল। খোদার আসমান আর জঙ্গল কেঁপে উঠল। কী অসম্ভব শাস্তি হয়েছিল সেই রাত্রিতে। সুখবাস বলল—কেউ জানে না বউ। কেউ বুঝবে না।

মদিনা স্বামীর পিঠে আঙুল বুলিয়ে লিখল—কাফ ফে রে। কাফের। তারপর আঁচল দিয়ে রগড়ে রগড়ে তুলতে থাকল সিমারের পিঠ।

গফুর জোলা, মদিনার বাপ, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর মনে পরম সন্তোষ আর শান্তি পেয়েছিল। গামছা-বোনা গরিব লোক, গামছা কাঁধে এ-হাট ও-হাট ফিরি করত। এমন কি ওপারে বাংলাদেশে চলে যেত গামছা বিক্রির জন্য। এক দিন শোনা গেল, লোকটি কী এক খেয়ালবশে নিজের বিবিকে সাথে ক'রে ওপারে চলে গিয়ে আর ফেরেনি। সংবাদ এল মদিনার কাছে, মদিনা গুনগুন ক'রে কাঁদল খানিক। তারপর স্বামীকে বলল—ইহজন্মে আমার আর কেউ নেই গো, তুমি ছাড়া। তুমি ফেলে দিলে কোথাও যাওয়ার ঠাঁই নাই। আমায় ফেলে দিও না। তুমি যখন যা চাও, যত কষ্টই হোক, আমি দেব।

কথা শুনে সুখবাসের প্রথম বিয়ের ঘটনা মনে পড়তে লাগল। গিয়াসজী যত কথা বলেছিলেন, সব মনে পড়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই সে জাহেদার মুখ মনে করতে পারল না। তার সমস্যা হয়েছিল, জাহেদাকে মনে করা। মনে করতে না পারা। সে চাইছিল, জাহেদাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে দেখবে। মৃত্যুর পর এতদিন হল কখনো জাহেদা দেখা দিল না। কেন দেখা দিল না? মনের মধ্যে কোনো ছবি নেই কেন? সিমার কি কোনো ছবি মনে রাখে না? নাকি জাহেদা পাক-পবিত্র ছিল বলে, তার নিঃশ্বাসে ফেরেস্তার গায়ের গন্ধ ছিল বলে সুখবাসের কাছে একদিনও এল না? মদিনা বলল—মনে করার চেষ্টা করো। শান্ত মনে ভাবনা করো। ধ্যান করো। জাহেদা আসবে।

একদিন হঠাৎ সুখবাস একটা স্পষ্ট কথা বিচার করতে শিখল। কেন আসবে জাহেদা? মদিনা বললেই কি আসবে? লেখাপড়া জানা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা না-দেওয়া বউ বলছে বলেই কি আসবে? তার তো দু'মুঠো ভাতের জন্য এখন আর পেট কাঁদে না। সে এখন আল্লার কাছে থাকে। তার খিদে লাগে না। আর যখন বেঁচে ছিল, মাটিতে ছিল, গোরের উপর দুনিয়ায় ছিল, তখন তার আশ্রয় দরকার ছিল। গিয়াসজী তার মেয়েকে দিয়ে আত্মীয় হতে চাইলেন কেন? না, তাঁর কেউ নেই। সইফুল্লা চাকুরি ছিনিয়ে নেবে। তাড়িয়ে দেবে। পথে বসাবে। তাই জাহেদাকে ঘুষ দিলেন তিনি। কিন্তু তারপর?

মদিনাও একটু আশ্রয় আর দু'মুঠো ভাতের জন্য পাষাণের তলায় পানি

দেখতে পায়। সিমারকে ক্ষমা ক'রে দেয়। দিনের বেলা সহবাসে রাজি হয়। সহবাস নয়। যৌন-ক্রিয়া। শেষ হওয়ার সাথে সাথে ঘরের মধ্যে থাকে না। উঠে পড়ে। দরজা খুলে বাইরে চলে গিয়ে দ্রুত হাতে কীসব কাজ করতে থাকে। কোনো কাজ না পেলে অযথা ঝাঁট দেয়। মুখ গম্ভীর। অপমানিত। অ-খুশি।

কিন্তু মদিনা যত কষ্টই হোক মরবে না। সেই প্রতিজ্ঞার শিখা মদিনার চোখে জ্বলতে দেখা যায়। মদিনা সবল পুষ্ট দুর্দান্ত যুবতী। সে কি বুঝবে ? বুঝবে না। জাহেদা কী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সুখবাসকে তৃপ্ত করার। সুখবাস বিড়বিড় করে—জানো, কেমন ক'রে মেরে ফেলি ? নীরবে মুখ বুঁজে অত্যাচার সইছিল। তার শরীর ছিল ঠাণ্ডা আর ভদ্র। হাল্কা আর ফুলের মতন। গন্ধিত আর পলকা। প্রথমে একটু আর্তনাদ করছিল। বিপদে ভয়ে যেমন মানুষ আল্লা আল্লা করে, তাই করছিল। বিড়বিড় করে দোয়া দরুদ পড়ছিল। ভাবছিল কোবানের আয়াতে বোধহয় মুহূর্তে পূর্ণাঙ্গ যুবতী হয়ে ওঠার শক্তি আছে। কিন্তু খোদা তাকে বাঁচাতে পারেনি।এক সময় সে জোরে আর্তনাদ করেছিল। তখন সুখবাস মুখে কাপড় ঠেসে দিয়েছিল। এক সময় হঠাৎ খেয়াল হল, জাহেদা কেমন নিঃশব্দ। ঠাণ্ডা। কাঁদছে না। জাহেদা মরে গিয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টা করেছিল সুখবাসের বাসনা পূরণের। যা তার কর্তব্য ছিল। গিয়াসজী কি সে-কারণেই সুখবাসকে ক্ষমা করতে পেরেছেন ? সমাজ কি সে-কারণেই এই ঘটনার তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়নি ? আচ্ছা এটাই কি নিয়ম ? জাহেদা কি সত্যিই খুব তুচ্ছ জীব ? তার মৃত্যু কি কিছু নয় ? সুখবাস ভাবে, কিছু নয়। কোনো ঘটনা নয়। অমন হয়ই। হতেই পারে। লোকে কিছু ভাবে না। অতএব মদিনা বলছে, জাহেদা আসবে। ধ্যান করলে আসবে নিশ্চয়। দু'মুঠো ভাতের জন্য নয়। তবু কেন আসবে সে ? আমি তো প্ল্যান ক'রে মারিনি। সিমার, তাই মেরে ফেলেছি। ভেবেছিল সুখবাস। জীবনের চাপে যেমন আদিম নিস্তরঙ্গ মস্তিষ্কেও অযুত অস্পষ্ট ভাবনা নড়ে উঠেছিল।

মদিনা চেষ্টা করছিল তার বিশ্বাস ও সাধ্যমতো। একটা পবিত্র বাতাবরণ রচনা ক'রে তুলত মধ্যরাতে। তাহাজুদ-নামাজে স্বামীকে প্রতিষ্ঠিত ও ধ্যানস্থ করতে চাইত। আগরবাতি জ্বেলে দিয়ে বলত—নামাজে খোদার কাছে হাত তুলে কাঁদো। মোনাজাত (প্রার্থনা) করো। জাহেদাকে ডাকো। ও আসবে।

সুখবাস চেষ্টা করেও স্বপ্নে জাহেদাকে দেখতে পেত না। নামাজে মোনাজাত করেও নয়। সুখবাসের ঘুম আসত না। এক সময় সে মদিনার সাথে মিলিত হতো। মদিনার পুষ্ট সবল দেহ জাহেদাকে আড়াল ক'রে দিচ্ছিল।

সুখবাস ভোরের নামাজ পড়ে প্রতিদিন অন্ধকার ঝাপসায় মক্তবে আসত।

গিয়াসজীর পাশে চুপচাপ বসে থাকত। পায়ে হাত দিয়ে কদমবুশি (প্রণাম) ক'রে সামান্য বেলা হলে বাড়ি ফিরে আসত। মক্তবে পড়াশুনার আর কোনো চাহিদা তার ছিল না। সুখবাস মনে করত, গিয়াসজীকে দেখলে তার কাবা দেখার মতন পুণ্য হয়। সুখ হয়। এইভাবে চলছিল। একদিন সহসা সেই ঘটনাটি ঘটাতে পারল সইফুল্লা।

সেদিন দুপুরবেলা জোহরের নামাজের কিছু আগে একবার দেখা করতে এসেছিল সুখবাস। প্রশ্ন করেছিল—কীভাবে জাহেদাকে দেখতে পাব আব্বাজী ? স্বপ্ন যে দেখি ন্যা !

গিয়াসজী বললেন—পাবে। আমি পাই। কতদিন মেয়ে আমার কাছে আসে বাবাজীবন। বসে। গল্প করে। খেতে চায়। ভালো ক'রে কোনোদিনই খেতে দিতে পারিনি তো ! খেতে চায় ! দু'মুঠি ভাতের জন্য সেই কোন দূব দেশ থেকে সুখডহরি এসেছি বাপ। পরের অন্নে কষ্ট আছে বাপজী। এই দ্যাখো, এতক্ষণও সইফুল্লাব মেয়ে ভাত নিয়ে এল না। ভাবছি, এরপব থেকে তোমাদের বাড়িতেই স্থায়ীভাবে খাব। তোমরা আমার জাযগীর (এক্ষেত্রে আশ্রয) হও। সেক্রেটারির অন্ন ভযানক সুখবাস। আর, চুনতী, মানে সাযরা, সেক্রেটাবিব মেযে, যে আমাকে ভাত দেয় রোজ। ভারি ফাজিল মেয়ে। খুব সেয়ানা ' দাঁড়াও। দেখবে ? কাউকে বলতে পারি না। তোমাকে দেখাই। কী সাংঘাতিক ব্যাপার।

গিয়াসজী চৌকির তলা থেকে বাক্স হাতড়ে সাদা চিরকুট তুলে এনে সুখবাসকে দেখিয়ে বলেন—দ্যাখো, কী লিখেছে !

সুখবাস স্তম্ভিত হযে দেখে, একছত্র কাঁচা হাতের লেখা। 'আমি আপনাকে শাদী করব ওস্তাদজী। ইতি আপনার প্রেমিকা চুনতী।' সুখবাসের চোখ দু'টি বড় বড় হয়ে ওঠে। মৌলবী বলেন—দেখছ স্বভাব। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, চুনতী ও-কথা লেখেনি। কেউ লিখে দিয়েছে। কী মনে করো ? সুখবাসেরও বিশ্বাস হয় না। এ-কথা চুনতী ওরফে সায়রার নয়। পেছনে কোনো গূঢ় মতলব আছে। সুখবাস জানালা দিয়ে দেখতে পায় সালোয়ার-কামিজ পরে উড়নি উড়িয়ে ঢাকনা ঢাকা ভাতের থালা নিয়ে চুনতী এদিকেই আগুয়ান। সাথে সাথে চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুখবাস। বলে—লেখাডা আমার সাথে থাকুক আব্বাজী ! মদিনাকে দেখাব। পরে চুনতীকে মদিনা ডেকে শুধিয়ে দেখবে। যাই আব্বা ?

সুখবাস দ্রুত মক্তব ছেড়ে পথে নামে। বাড়িতে এসে কথাটা মদিনাকে বলতে যাবে এমন সময় পাড়ার একটি মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলে—সইফুল্লার দল গিয়াসজীকে মেরে ফেললে গো! সুখবাস ভাই, দাঁড়ায়ে কর

কি, লাঠি নিয়ে চলো।

সাথে সাথে সুখবাসের বাপ-চাচারাও মক্তবমুখো ছোটে। সুখবাসও একখানা লাঠি হাতে ছুটে আসে। ঘটনাস্থলে এসে দেখে চারিদিক থেকে ভিড় ক'রে গিয়াসজীকে গোল ক'রে ঘিরে ফেলেছে ওরা। টানাটানি চলছে। গিয়াসজী নাকি চুনতীকে উলঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। এর আগেও নাকি এমন ঘটনা ঘটতে গিয়ে ঘটেনি। আজ শালোয়াব-কামিজ ছিল বলে রক্ষে! সুখবাসরা এসে পড়ায় উত্তেজনা কিঞ্চিৎ থেমে আরো বেড়ে যায়। সুখবাসের লাঠি গিয়ে সইফুল্লার মাথায় আছড়ে পড়ে। অন্য কারো হাতে লাঠি ছিল না। সইফুল্লার দলের হিম্মৎদার সুখবাসের মতন প্রকাণ্ডদেহী দু'চারজন আছে, উনিশ বিশ। তারা নিরস্ত্র। ফলে সইফুল্লার সামান্য রক্তপাত হয়। অদম্য সিমারের লাঠির বিজলি ঘাত সকলকে অপ্রস্তুত ক'রে দেয়। ঘটনা আরো উত্তেজক হয়ে ওঠে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বেশিদূর গড়ায় না। সুখবাসরা ফিরে আসে। গিয়াসজীকে সাথে ক'রে টেনে আনে। অতঃপর সইফুল্লা কড়া সিদ্ধান্ত করে, মিটিং ক'রে গিয়াসজীকে বরখাস্ত করবে। সুখবাস হাতের চিরকুট দেখিয়ে বলে—ঘটনা ভেন্ন। আমার শ্বশুর নিদোষী।

সমাজের দু'টি ভাগ স্পষ্ট হয়ে যায়। অন্যান্য দেশের (গ্রাম)মাতব্বররা জড়ো হয়ে বিচার বসায়। তাকে বাইশী সভা বলে। বাইশখানা গ্রামেব মানুষ যোগ দেয় সেই বিচার সভায়। সেই বিচারে একটি দিন ধার্য করা হয়। উক্ত দিন এই ধরনের জনসমাবেশের মধ্যে মসজিদে উঠে গিয়াসজী কোরান হাতে ক'রে বলবেন—চুনতীকে তিনি স্পর্শ করেননি। মৌলবীর চরিত্র সর্ম্পকে সন্দেহ দেখা দিলে মাদ্রাসা টিঁকবে না। কারণ, অধিকাংশই মেয়েছেলে ছাত্রী। এক সপ্তাহ বাদে সেই দিনটি ধার্য করা হয়। মক্তব আবাস থেকে বিতাড়িত গিয়াসজী সুখবাসদের বৈঠকে আশ্রয় নিয়ে চলে আসেন। তাঁর ঘাড় সেই যে নিচু হয়ে গেল, তিনি আর কারো সামনে স্পষ্ট ক'রে মুখ তুললেন না। মনে হতো সব সময় তিনি ঢুলছেন। প্রায়ই চোখ মুদে থাকতেন। যেন কী সব তিনি ধ্যান করতেন বোবার মতন।

সেই নির্দিষ্ট ধার্য দিন এল। সেইদিন সুখবাস বাড়ির নতুন বলদ জোড়া জুড়ে দৌলতডিহির ক্ষেতে গিয়েছিল ধান আনতে। ভেবেছিল দুপুর নাগাদ ফিরবে। আছরের নামাজের (বিকাল বেলার নামাজ) পর মসজিদে উঠবেন গিয়াসজী। কোরান হাতে ক'রে কসম করবেন, চুনতীকে তিনি স্পর্শ করেননি। কোনো গোলমালও হয়ত হতে পারে। ভেবেছিল সুখবাস। এইসব ভাবনার চাপে তার মাথা গরম হয়েই ছিল। কাদাপাঁক ঠেলে, গাড়ি ঠেলে আনতে হয়েছিল। গায়ে

পানি-কামড়ি পোকায় কুটকুট ক'রে জ্বালা করছিল। হাঁটু অব্দি কাদায় লিপ্ত দেহ। পরিশ্রমে অবসন্ন হয়েছিল সুখবাস। জিভ ঝুলে পড়ছিল। ধোঁকাচ্ছিল ঘনঘন। গরু জোড়াও কথা শুনছিল না। মাঝে মাঝেই বেচাল চলছিল। সব মিলিয়ে সুখবাস তখন ভয়ানক উত্তেজিত। দিশেহারা। বাড়িতে এসে বাহির পালাঙ্গায় (বাহিরের উঠোন) গাড়ি দাঁড় করালো। গা ঘামে জবজব করছে। চোখে মুখে বুকে ঘামের স্রোত। নিঃশ্বাস টানছে জন্তুর মতো। ডাকল—মদিনা ?

মদিনা আর দাদী দুপুর বেলায় ঘরের মধ্যে রসালাপ করছিল। ডাক শুনে সাথে সাথে উত্তর দিতে পারে না। তখনো ওদের কথার পূর্ণচ্ছেদ হয়নি। ওরা খিলখিল ক'রে হাসছিল। এদিকে ভেতর উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে সুখবাস। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। মসজিদে লোক জমে গিয়েছে কল্পনা করতে পারছে সুখবাস। তার ধৈর্য হারিয়ে যেতে থাকে। মনে হয়, এমন অবাধ্যতা করার কথা ধর্মে নাই। মদিনা তাকে যেন পরোয়া করছে না। আবার ডাক দেয় গলা তুলে মদিনাকে। মদিনা তখন দাদীকে হাসতে হাসতে চোখ টিপে গলা চেপে বলে—সিমার এসে গেল দাদী ! দাদী বলে—ও ! সিমার এলো বুঝিন ! যাও বহিন তৈয়ার হও। ঠাণ্ডা করো, যাও !

কথাটা সুখবাস শুনতে পায়। ভয়ানক অবাক লাগে তার। তাহলে কানের আড়ালে এরা তাকে সিমারই মনে করে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করে। গল্প মারে। মনে হতো, ভালবাসে। আসলে ঘৃণা করে। ছোটলোক ভাবে। সহ্য হয় না সুখবাসের। বুকের মধ্যে সত্যিই সহসা সেই সিমার, নির্বোধ সিমার জেগে ওঠে। কাপড় চোপড় ঠিক ক'রে গুছিয়ে বেরিয়ে আসতে তখনো দেরি হয় মদিনার। সুখবাস ক্ষেপে যায়। সিমার ভয়ংকর হয়ে ওঠে। পায়ে কাদা। গায়ে জ্বালা। গা ধোয়া, পা ধোয়া, গোছল ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থাই রাখেনি মদিনা। মদিনা বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতেই মস্তিষ্ক পশুর মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হয়। সিমারের ঘাতক-বৃত্তি চূড়ান্ত সীমায় ওঠে। সুখবাস তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ চিন্তা করে না। এক বদনা পানি এগিয়ে দেয় মদিনা। এক বদনা পানিতে কী হবে ? হাত-পা জুড়োবে ? গোছল হবে ? পানি-কামড়ি নিস্তার দেবে ? অসম্ভব রাগ হয় সুখবাসের। বলে—তুমি আমাকে ঘেন্না করছ ?

—মদিনা অবাক হয়। বলে—কেন ? ঘেন্না করব কেন ?

—তাই দেখছি।

—না। ঠিক দেখছ না।

—ঠিকই দেখছি। তুমি ঘেন্না করো। আমাকে সিমার বুলে গাল দেও।

—ঠাট্টা করেছি।
—তুমি আমাকে ঠাট্টা করো ?
—ভুল করেছি।
—এক বদনা পানি ! এখন বুঝিন ঠাট্টা মারানোর টাইম ?
—ডোল ক'রে এনে দিচ্ছি পানি।
—না। আনতে হবে না। আমি তুমাকে তালাক দিচ্ছি। তুমি চল্যা যাও।
—সে কি ?

ভয়ানক অবাক হয় মদিনা। হঠাৎ আর স্বামীকে আর চিনতে পারে না। স্বামীরা কেমন ক'রে তালাক দেয় নানান গল্প শুনেছিল সে। আজ বুঝতে পারে, তালাক আসলে পুরুষের হাদীসী অসুখ। হিস্টিরিয়া। দাঁত-খিচুনি বদ-হাওয়ার দোষ।

'তালাক' বলে ওঠে সুখবাস। সাথে সাথে মদিনা ছুটে গিয়ে স্বামীর মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরতে চেষ্টা করে। সুখবাস ওকে ধাক্কা দিয়ে উঠোনে ছিটকে ফেলে দেয়। তারপর আরো জোরে 'তালাক' 'তালাক' ক'রে ওঠে। পাশের পড়শীদের গলা তুলে ডাক দেয়—এসো। শোনো। আমি তালাক দিচ্ছি গো। তালাক। তালাক। বায়েন তালাক।

মুহূর্তে উঠোন পাড়ার লোকজনে ভর্তি হয়ে যায়। তখনো উঠোনে পতিত মদিনা হতবুদ্ধি। বিশ্বাস করতে পারছে না। সুখবাসের বাপ লাঠি হাতে ছুটে এসে সুখবাসকে বেদম মারতে শুরু করে। শালা সিমারই বটে। শুয়োর কোথাকার। মাথা-গরম, হট-টেম্পার শালা। বেবুঝ। বদমাস ! শালার বেটা শালা, নিমদ্দা। দুব্‌লা মেয়েদের ওপর মর্দানি করে। আজ উকে আমি মেরেই ফেলাব।

বেদম মার খেয়ে সুখবাস উঠোনে শুয়ে পড়ে। কষ ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে। পিঠে লাঠির দাগ বসে গেছে। হতবুদ্ধি মদিনা ছুটে গিয়ে শ্বশুরের লাঠি চেপে ধরে সবেগে। বলে—মারবেন না। ও তো বোঝে না কিছু। ও যে ঠাট্টাও বোঝে না গো ! বলেই মদিনা দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্চকণ্ঠে কেঁদে ওঠে। তার কণ্ঠ আকাশে উঠে খোদার আরশ (সিংহাসন) অবধি ছুটে যায়।

তিন

মসজিদে ওঠেন গিয়াসজী। কোরান হাতে আজান দেওয়া সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর হাত-পা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। তিনি সুখবাসকে তালাক দিতে শুনেছেন। দেখেছেন। তিনিও বৈঠক থেকে ভেতরের উঠোনে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন মদিনার তীক্ষ্ণ কান্না লম্ব হয়ে উঠে খোদার সিংহাসনের দিকে ঝলমল ক'রে বর্শার মতন উঠে যাচ্ছে। তারপরই তিনি মসজিদে চলে আসেন। লোক সমাগম হয়েছে প্রচুর। ভিড়ের মধ্যে গিয়াসজী লক্ষ করেন, সুখবাসও এসেছে। গায়ে পাতলা চাদর জড়ানো। চোখ মুখে প্রহারের চিহ্ন স্পষ্ট। মনে হয় পুরনো যুগের একটা নির্বাক মূর্তি। আদি মানব। সেই দিকে চেয়ে দেখেন গিয়াসজী। হাত-পা প্রবল কেঁপে ওঠে। ছোট কোরান খানা পরম মমতায় সবেগে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেন। তারপর কাঁপা গলায় বলতে থাকেন—আমি কোনো পাপ করিনি পিয়ারে হাজেরিন (প্রিয় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী)। আপন বিবি ছাড়া কোনো স্ত্রীলোককে ছুঁইনি। সায়রা আমার মেয়ের মতন। আল্লাহ আমার ও সায়রার ইজ্জত রক্ষা করবেন। বলতে বলতে গিয়াসজী আজানের সিঁড়ি ভেঙে টলমল করা পায়ে নিচে নেমে এসে সইফুল্লার পায়ের কাছে বসে পড়েন। পকেট থেকে একখানা সাদা লিখিত দরখাস্ত বার করে এগিয়ে ধরে বলেন—আমার ইস্তফা। বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েন। সাদা টুপি মাথায়, সাদা কালিদার, পরনে সবুজাভ লুঙ্গি, নরম অসহায় আদল ঈশা চাচাকে ছুটে গিয়ে জাপ্টে ধরে কাতর গলায় ডেকে ওঠে—চাচা! চাচা! চাচা গো!...

সভা ভেঙে যায়। সেই থেকে গিয়াসজী মসজিদেই থেকে যান। তাঁকে মসজিদের বাইরে খুবই কম দেখা যেত। তাঁর কাছে সুখবাসদের বাড়ি থেকেই আগের মতন ভাত যেত। কিন্তু বহে নিয়ে যেত অন্য লোক। সুখবাস নয়। কেন নয়? কারণ সুখবাস তালাকের সভা শেষে আর বাড়ি যায় না। বাড়ির পেছনের বাগানে এসে ঢোকে। আম লিচু কাঁঠাল বহড়া জামের বাগান। ফল ফুরিয়েছে। কিন্তু গাছের ডালে এখনো মাচা বাঁধা। বাঁশ (লগি) বেয়ে সেই মাচায় উঠে আসে সুখবাস। আজ থেকে এই মাচাই তার পালংক।

মদিনা তার পর হয়ে গিয়েছে। মদিনার চোখে চোখ পড়লে পাপ হবে। মদিনার কোথাও যাওয়ার ঠাঁই নাই। মদিনা থাকবে বাড়িতে, সুখবাসের ঘরে। সুখবাস থাকবে জঙ্গলে, অন্যের ঠেকে বা কোথাও। মদিনা আর সুখবাস সামনা সামনি হওয়া ধর্ম বিরুদ্ধ। তালাকের সাথে সাথেই মদিনার উচিত ছিল বাপের

বাড়ি চলে যাওয়া। মদিনা কোথায় যাবে ? বাপ কোথায় ! মদিনা সুখবাসের ঘরেই আছে।

সুখবাসের বুদ্ধি বেড়ে গেছে। বিচার ক্ষমতা শক্তিশালী হয়েছে। সে আর কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে চাইল না। কখনো যদি বাড়ি যাবে স্থির করত, তবে জঙ্গল থেকে খবব পাঠাত, সে আসছে। ভাইরা মায়েরা মাচায় গিয়ে তার সাথে কথা বলে আসত। খাবার পৌঁছে দিত। সুখবাসকে ঘরে টেনে আনতে পারেনি। গভীর বেদনা পেলে মানুষ যেমন নরম আর ভারী গলায় কথা বলে সুখবাস সেইভাবে কথা বলত। বলত—তোমরা কেনে দুঃখ পাও। কেঁদো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি মদিনাকে ছাড়তে পারব না। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না। ওরই ঘর, ওকে দিয়ে আমি বনবাসী হয়েছি। তিন মাস পর আমি যাব

জঙ্গলে মশার কামড় সইতে হয়। ভয়ও করে একলা। মদিনাকে দেখতে ইচ্ছে করে। কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু উপায় নেই। সইফুল্লার দল পাহাবা দিচ্ছে। সুখবাসদের পালাঙ্গায় মাচার উপর মধ্যরাত অব্দি আজকাল লোক গুলজার হয়। সইফুল্লার লোক এসে বসে থাকে। ভোরে দুপুরে সাঁঝে লোক ঘুরে বেড়ায়। সুখবাস বাড়িতে ঢুকছে কিনা লক্ষ করে। কারণে অকারণে সইফুল্লার লোক বাড়িতে বিড়ির আগুন দরকার বলে ঢুকে পড়ে।

এই অত্যাচার বাবা সইতে পারে না। তার ধৈর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছেলের জন্য মায়া হয়। আবার তার আদিখ্যেতা দেখে রাগ হয়। এই বাড়ির আগের তেজ নষ্ট হয়ে যায়। বাপ চাইছিল, ছেলে জঙ্গল থেকে ফিরে এসে ঘরে থাক। মদিনার দায়িত্ব খোদার। যেথা খুশি সে চলে যাক। ফুরিয়ে যাক। শেষ হয়ে যাক। ভিখিরি হয়ে যাক। বেশ্যা হয়ে যাক। মদিনাকে বাড়ির কেউই আর তেমন সহ্য করতে পারে না। কিন্তু মদিনা পাগল সুখবাসের কথা ভেবে, মুখ চেয়ে এই যাতনার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সংসারে পড়ে থাকে। বুঝতে পারে পাগল সুখবাস, নিষ্ঠুব সিমার তাকে ভালোবেসেছে। তারই জন্য জঙ্গলে পড়ে আছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তিনমাস সময় তো কম নয়। এতদিন ধৈর্য থাকবে তো সুখবাসের ? গভীর রাত্রে স্ত্রী-দেহের জন্য সুখবাসের কষ্ট হবে না ? বাড়ির লোক মাচায় গিয়ে নানারকম ক'রে বোঝাচ্ছে। চাপ দিচ্ছে। অথচ মনের যে জোরে লোকটা অমন ক'রে পড়ে আছে তার পক্ষের একমাত্র মানুষ মদিনাই।

গভীরতর রাতে একদিন মদিনা জঙ্গলের মাচায় এসে ওঠে। দেহদান করে। কোনো কথা হয় না। কোনো কথা বলে না। দেহদানের মধ্যেই থাকে মানুষের আর এক ধর্মশক্তি। যা কেতাবী ধর্মের চেয়ে গূঢ়। যেকথা মদিনা জীবন ও জৈব প্রাণে অনুভব করে। পর্দা হাদিস কোরান ঈমান সে রাত্রির অন্ধকারে জলাঞ্জলি

দিয়ে অদ্ভুত ক'রে নিঃশব্দে হেসে ওঠে। পাগলের মতন। তার কোনো উপায় থাকে না। কোনো বিচার থাকে না। সমাজ থাকে না। সে ভাবে, সে তো সিমারের ছেড়ে দেওয়া বউ। বড় জোর দোযখের জ্বালানি বই নয়।

এইভাবে তিনমাস কেটে যায়। মাচায় একলা কয়েদি অন্ধকারে শুয়ে থাকে। পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের নক্ষত্র চোখে পড়ে। চাঁদ চোখে পড়ে। মনে পড়ে আর এক গভীর অরণ্যের কথা। একটা ঘোড়ার কথা। পাতায পায়ের শব্দের কথা। সব মনে পড়ে। সে কান পেতে থাকে পাতায় কোনো পায়ের শব্দ উঠছে কিনা! রাত্রি বেড়ে যায়। ঘুম আসে তার। তখন সে একদিন এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে। তার তিনমাস পূর্ণ হয়। স্বপ্ন দেখে কেমন এক পাতলা জলের মধ্যে মৃতপ্রায় মাছের মতন একটি মেয়ে ভাসছে। তার একখানা হাত জাহেদার মতন, অন্যখানা মদিনার। সেই জলে নেমেছে সুখবাস। জলের তলা থেকে দু'খানি হাত তার দিকে ছুটে আসছে। কী বিচিত্র দু'খানি হাত ছুটে আসছে। সুখবাসের পা জড়িয়ে ধরে জলের গভীরে টানছে। পা ছাড়িয়ে নিতে পারছে না। জাহেদা তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চায়? ভয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে সুখবাস। জাহেদাকে দেখল সে। কী ভয়ংকর! একখানা হাত মোটা বলিষ্ঠ। অন্যখানা লিকলিকে। ভয়ে সুখবাসের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। জাহেদার লিকলিকে হাত অসহায় হয়ে জলের মধ্যে সুখবাসকে হাতড়াচ্ছে। ভয় পায় সুখবাস। ঘুম ভেঙে দেখে মাচার উপর সে শুয়ে আছে। কেউ নেই। পায়ের শব্দ নেই পাতার উপর। ভীষণ ভয় পায় সুখবাস। মাচা ছেড়ে নিচে নেমে আসে। শুকনো পাতা মাড়িয়ে সেদিন অন্ধকারে চোরের মতন সে গাঁয়ের মসজিদে এসে ওঠে। তারপর গিয়াসজীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলে—আব্বাজী!

চমকে উঠে ফ্যালফ্যাল ক'রে কুপির আলোয় গিয়াসজী সুখবাসকে দেখতে পান। গায়ে হাত দিয়ে সস্নেহে বুকের কাছে টেনে বলেন—তুমি এসেছ!

চার

সুখবাসের চেহারা ছবি দেখে শিউরে ওঠেন গিয়াসজী। কেমন শুকিয়ে গিয়েছে, বন্য মোষের মতো স্বাস্থ্য আর নেই। চোখের কোলে কালির পুরু দাগ। সুখবাস বলে—আমাকে ঘরে ফিরিয়ে দ্যান বাপজী! আমি ঘরে যাব। তিনমাস দশ দিন কেটে গেল। মদিনার একটা বিহিত করেন।

সেকথা ভেবেছেন গিয়াসজী। বললেন—কার সাথে শাদী দিই মদিনার? কে করবে? করলেই তো হয় না, দয়া ক'রে ফের তালাক দেবে কিনা তেমন কারুকে

যোগাড় করতে হবে ! তোমার কোনো দোস্ত....

সাথে সাথে সুখবাস বলে—না বাপজী ! কারুকে বিশ্বাস নাই । মানুষের মুন তো চাখতে পারি ন্যা । দোস্ত বলেন, বন্ধু বলেন, আপনিই সব আমার ! আচ্ছা, ঈশা কি রাজি হয় না ?

—ঈশা !' অস্ফুট উচ্চারণ করেন গিয়াসজী । তারপব কিছুক্ষণ দম ধরে চিন্তা ক'রে বলেন—বেশ তাই হবে । ঈশাব সাথেই নিকে পড়িয়ে মেয়েকে হালাল করিয়ে তোমার হাতে তুলে দিবু । ঈশা ভালো ছেলে । চাচার কথা ঠেলতে পারবে না । যাও । নিশ্চিন্ত থাকো তুমি ।

সুখবাস অরণ্যে ফিরে যায় ।

পরদিন ঈশাকে প্রস্তাব কবতেই ঈশা দীর্ঘসময় মাথা নিচু ক'রে থাকে । গিয়াসজী বলেন—বিয়ের পরদিন ভোরে মদিনাকে ত্যাগ করবে । তালাক দেবে । রাতটুকুর মতন...

ঈশা চাচার কাছে থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই গিযাসজী ধমক দিয়ে ওঠেন—কী হল তোমার ? কথা বলছ না যে ? তুমি রাজি নও ? আমার হুকুম, তুমি নিকে করবে । যাও । সুখবাসের বাড়ি সন্ধ্যায় আসবে । আমি অপেক্ষা করব ।

রাত দশটা নাগাদ বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় । ঈশা সেজেগুজে এসেছে । চোখে সুর্মা অব্দি টেনেছে । গায়ে ধোয়া কলিদাবে আতরশুদ্ধ মেখেছে । খুব ধীর স্থির ভাবে মন্ত্র-কলমা ইত্যাদি বয়ান পড়ে গেল ঘাড় কাত ক'রে । বিয়ে গিয়াসজীই পড়ালেন । তাবত প্রাঙ্গণ লোকে গিজগিজ করছে । বৈঠকখানায় মুখোমুখি বর-কনে বসে আছে । হ্যাজাক জ্বলছে থামের পাশে ঝুলন্ত । মাঝে মাঝে লোকজন বৈঠকের বারান্দায় বর-কনেকে ঘিরে উপছে গিয়ে ঢেউয়ের মতন ছুঁয়ে সরে আসছে । ভিড়ের মধ্যে সুখবাস কোথাও নেই । গিয়াসজী চিন্তা করলেন, সুখবাস নিশ্চয়ই জঙ্গলে মাচায় শুয়ে আছে । আসলে সুখবাস হ্যাজাকের আলোর বাইরে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব অনুষ্ঠান লক্ষ করছিল । জাহেদার বিয়ের মতন এ-অনুষ্ঠান নয় । সুখবাস কান খাড়া ক'রে শুনবার চেষ্টা করে গিয়াসজী ঈশাকে কী বলেন । লোকের কথার গোলমালে, চাপা গুঞ্জনে, এলোমেলো শব্দের মধ্যে কোনো কথাই সে শুনতে পায় না । শীত পড়েছে । গায়ের জামার বোতাম আটকায় । মোটা চাদরখানা জড়িয়ে নেয় । অপেক্ষা করে । গিয়াসজী শরবত খাওয়াচ্ছেন ভাইপোকে । সেই এঁটো শরবত মদিনার মুখে তুলে দিচ্ছেন ।

ভিড়ের মধ্যে সইফুল্লার দলও রয়েছে । তারাও দেখছে । গিয়াসজী ভাইপোর

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—মনে রেখো তুমি মুসলমান। মুসলমানের ইমান খুব কড়া। তুমি সিমার নও। তুমি ঈশা। আজ তোমার পরীক্ষার রাত। মুসলমানকে একা যুদ্ধ করতে হয়। চলো। তোমবা দু'জনে ঘরে চলো।

দু'জনই ঘরে ঢুকে যায়। দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে চৌকাঠের গোড়ায় একখানা চেয়ার টেনে এনে প্রহরীর মতন বসে পড়েন গিয়াসজী। এত দিনের মন-মরা মানুষটি যেন সহসা তাজা হয়ে উঠেছেন। বলেন—আমি কথা বললে প্রতিটি কথার জবাব দেবে ঈশা। দেরি করবে না।

ঈশা জবাব দেয়—জী! খুব নম্র উত্তর। সেই স্বর দূরবর্তী বাইরের মানুষ শুনতে পায় না।

এরপব ধীরে ধীরে ভিড় পাতলা হতে থাকে। সবাই বুঝতে পারছিল, ঐভাবে লোকটি সারারাত পাহারা দেবে। অতএব আড়ি পেতে ঘটনা শোনা বা দেখা যাবে না। পুরো রসটা বেহেড মৌলবী মাঠে মারলেন। চলে যেতে থাকে লোকজন। দু'একজন তখনো অতি উৎসাহী লোভী ছেলেমেয়ে ঘুরঘুর করে। গিয়াসজী তাদের কড়া ক'রে বলেন—যা দেখবার শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন ওরা ঘুম যাচ্ছে। যাও। চলে যাও।

অগত্যা তারাও বিদায় নেয়। কেবল বৈঠক থেকে একটু দূরে বিচ্ছিন্ন বাড়ির জানালায় দু'টি চোখ জেগে থাকে। নাদিরা ফুপু। তিনি গিয়াসজীর মতন একজন মুসলমানকে দেখছেন। ঘুমুতে পারছেন না। রাত্রি বেড়ে চলে। গিয়াসজী ভেতরের দিকে প্রশ্ন করেন—তোমার কি কষ্ট হয় ঈশা?

ঈশা উত্তর দিতে দেরি করে। একটু উষ্ণতা মেশানো গলায় গিয়াসজী ফের শুধান—কষ্ট হয়? উত্তর আসে—জী না! কিন্তু চাচা! সুখবাস আমার বোনকে এইধারা রাত্তিরে মুখে কাপড় গুঁজে মেরেছে।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি মদিনাকে স্পর্শও করবে না। প্রমাণ করবে তুমি আমার রক্তের পুত্তলি, তুমি ইসলামের সেবক। খাদেম। তুমি সিমার নও। দুর্বল অসহায় যে তার দেহে আঘাত কোরো না। এক ফোঁটা রক্ত যেন না ঝরে! বলতে বলতে হাউ হাউ ক'রে বৃদ্ধ ডুকরে উঠলেন। তারপর কান্না ভেজা গলায় ডেকে ওঠেন—মা জাহেদা! মা গো!

ঠিক এইসময় ভিতরের দৃশ্যপট অন্যরকম। ঈশা মদ্দিনার দিকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে এগিয়ে এসেছিল। গায়ের কাপড় টান দিয়ে খুলে ফেলেছিল। মদিনা কিছু বলেনি। মুখ তার শুকিয়ে গিয়েছে। কণ্ঠে কথা ফুটতে চাইছে না। সহসা সে দ্রুত অসহায় হয়ে কেমন যেন উত্তর দেয়—জী! আব্বা! আমি এই তো!

আপনার জাহেদা !

ঈশা ভয় পায়। সংবিত হয় তার। পেছনে সরে এসে ঘামতে থাকে। তারপর চিৎকার ক'রে ওঠে—'না !' না-মন্দা চাচা। গরিব। খেতে পায় না। জোর নাই। জানের ভয়ে যে ইসলাম ইসলাম করে, তার ইসলাম কেউ নেয় না। আমি মদিনাকে ছাড়ব না। তালাক দিব না। কিছুতেই না।

কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না। মদিনার চোখে চেয়ে নিষ্পলক দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্রি আরো গভীর হয়।

একসময় গিয়াসজী দেখতে পান, মাটির উপর দিয়ে মাটির বুক ছুঁয়ে একটি হ্যারিকেন এদিকে এগিয়ে আসছে। মাটির এক হাত উঁচু বুক ছুঁয়ে চলে আসছে। হ্যারিকেন তা প্রথমে বোঝা যায় না। এক ফোঁটা আলো দেখতে পাওয়া যায়। কাছে এলে দেখা যায় একখানা ছইতোলা গরুগাড়ি। সাথে আট-দশ জন লোক। সইফুল্লার দল। সইফুল্লা গিয়াসজীর সামনে এগিয়ে এসে বলে—খুব অনাচার করেছেন। এবার চলুন। ঈশার সাথে আমাদের সব কথা হয়ে গিয়েছে। ওবা স্বামী-স্ত্রী যাচ্ছে। আপনিও ওদের সাথে চলে যান। ভোর পাঁচটায় বাস। পাকা রাস্তা অব্দি তুলে দিয়ে আসবে।

দেখতে দেখতে আবার লোকজনে তাবত উঠোন স্রোতের মতন ভরে যায়। সইফুল্লার গলা শুনে দরজা খুলে বাইরে ছিটকে বেরিয়ে আসে ঈশা। গিয়াসজী চমকে ওঠেন। হঠাৎ একটি সঙিন বাঁধে জলের চাপ বেসামাল হয়ে ছোট ছিদ্র দেখা দেয়। সেই ছিদ্রপথে জল পিচকারির মতন ছুটে বার হতে থাকে। ঈশাকে তাঁর সব কথা বলা শেষ হয়নি। তিনি খুশি হয়েছিলেন, মদিনা খুব বুদ্ধিমতি। মা বলতেই সাড়া দিয়েছিল। ভালো করেছে। কিন্তু সেই ডাকও যে নিষ্ফল হয়ে যায়।

লোকের ভিড় আরো বেড়ে যাচ্ছে। দূরের ঝোপটা নড়ে কেঁপে ওঠে। কেউ তা লক্ষ করে না। ঈশা সটান গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ে। মদিনাকে সইফুল্লার লোক জোর ক'রে টেনে হিঁচড়ে আনে। বাইরে এনে ঠেলতে ঠেলতে গাড়ির দিকে নিয়ে যায়। মদিনা তখন আকাশে মুখ তুলে আর্তনাদ ক'রে ওঠে। সুখবাসের বাড়ির এসবের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। কেউ বাধা দিতে ছুটে আসে না। কেউ না। দূরের জানালায় ফুপু ডেকে ওঠেন প্রবল কাতরতায়—সুখবাস। ঝোপ নড়ে ওঠে।

সুখবাস ছুটে আসে না। দূরের ঝোপ থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে। সইফুল্লা বলে—যাও। হাঁকিয়ে যাও। তিন ক্রোশ পথ। মাঝরাত এখনো সবখানি গড়ায়নি। কে চালিয়ে যাবি রে ?

এই সময় মাথায় পাগড়ি বাঁধা একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে ঠেলে এসে গাড়িতে এক লাফে উঠে বসে গরু খেদিয়ে দেয়। গাড়ির সাথে চার অনুগামী। সইফুল্লার লোক। গাড়ি ছাড়বার একটু আগে গিয়াসজীকে জোর ক'রে ছইয়ের ভেতব ঠেলে দিয়েছে তারা। চারজন পায়ে হেঁটে। একজন দেদার বক্স মৌলবী। বাকি তিনজন তালবিলিম। তালেবুল এলেম। ছাত্র।

গাড়ি চলছে দ্রুত। এক মাইল নিঃশব্দ আসার পর গিয়াসজী চোখ খুললেন। চরাচর কালো ভয়াল অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। গাড়ির তলায় ঝুলন্ত কালি-পড়া অস্পষ্ট হ্যারিকেনের ভৌতিক আলো। সেই আলোর ধাক্কায় চার অনুগামীর ছায়া দুলছে। তাদের এখন মানুষ মনে হচ্ছে না। অবাস্তব কিছু মনে হচ্ছে। দূরে দিগন্তের দিকে চাইলেন গিয়াসজী। কিছুই দেখতে পেলেন না। কোথায় চলেছেন এই ভয়াবহ রাত্রিতে ? বললেন—সইফুল্‌া সাহেব এমন সম্মান ক'রে পৌঁছে দেবেন, ভাবিনি।

দিদার বক্স মৃদু গলায় জবাব করেন—জী ! মানীর মান খোদার হাতে।

গিয়াসজী বলেন—আপনারা সাথে আছেন, ভালোই হল।

—কেন ? দিদার জানতে চান।

গিয়াসজী কোনো উত্তর করেন না। গাড়ি চলতে থাকে। দেখতে দেখতে এক ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হয়। অকস্মাৎ গিয়াসজী গুনগুন ক'রে ওঠেন। আরবী সুরা। কোরানের সুদীর্ঘ আয়াত। একেবারে কণ্ঠস্থ। গলা থেকে মন্দ্রসুরে উদ্গত হয়। মাঝে মাঝে শ্বাসাঘাতে উচ্চকিত হয়ে ওঠেন তিনি। অনর্গলিত চিকণ ফোয়ারা অক্ষরে অক্ষরে জড়িয়ে তীব্র বেগে প্রকাশিত হতে থাকে। মুহূর্তে থেমে তিনি নির্দেশ করেন—তুমিও বলো বাপজী ! ঈশা হক। বলো বাপ !

ভীষণ আদুরে অলৌকিক আর্তি ঝরে পড়ে গলায়। ঈশার নাকে মদিনার সুবাসমিশ্রিত শরীরের ঘ্রাণ ছড়িয়ে গিয়েছিল। মদিনার শরীরের গভীরে পৌঁছতে বাসনা হয়েছিল। তাকে সহবাসের মরণে কতদূর টানা যায় পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হয়েছিল। সব মিথ্যা হয়ে গেল। মনে হল চাচার কণ্ঠে নবী যেন কথা বলছেন। সুরার সুর সংক্রামিত করল ১৭/১৮ বছরের কিশোর ঈশাকে। সমস্ত পরিবেশ সুরে গুঞ্জনে অপার্থিব হয়ে উঠতে লাগল। ঈশা এক সময় গুনগুন করতে শুরু করল। কেমন সম্মোহিত হয়ে যেতে লাগল।

সেই আবিষ্ট ভাইপোকে গিয়াসজী নরম সুরে বললেন—তালাক দাও। এক তালাক দাও। আমরা এক ক্রোশ এসেছি।

ঈশা হক তন্ময়তার মধ্যেই বলে উঠল—তালাক ! তারপরই আবার কোরান পাঠ ক'রে যেতে লাগল। দিদার বক্স আঁৎকে উঠলেন। বললেন—এ কী

করছেন গিয়াসজী !

গিয়াসজী উত্তর দিলেন না। অনুগামী তিন ছাত্রকে বললেন—মিজান, মকবুল, ঈদ্রিশ ! তোমরাও পড়ো ! আল্লার কালাম পড়ো।

তিন ছাত্র সাথে সাথে প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। দিদার আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—সর্বনাশ ! করেন কী ? আমার যে ভয় করছে ! সইফুল্লা সাহেব বলেছিলেন··দেখুন, আমার চাকবির কথাটা ভাবুন, মানে আমার দায়িত্ব··

কোনো কথাই শোনেন না গিয়াসজী। আরো জোরে খোদার কালাম ধ্বনিত ক'রে চলেন। এ এক অদ্ভুত অভিযাত্রা তাঁর। যেন অলৌকিক অপার্থিব মোহগন্ধহীন সুখকর দেশান্তর। জীবনের সব অপমানের অমৃতময় গ্রহণে তিক্ততার প্রত্যাখ্যান। তিনি গুঞ্জরিত মুকুলিত। প্রস্ফুটিত হয়ে নিজেকে গেথে গেঁথে মহাকাশে খাড়া ক'রে তুলছেন।

নদীর কিনার দিয়ে গাড়ি চলেছে। জলে প্রতিধ্বনিত হয় খোদাব কণ্ঠস্বর। ফিরে এসে মানুষকে প্লাবিত করে। দুই ক্রোশের মাথায় দ্বিতীয় 'তালাক' ঘোষিত হয়।

হঠাৎ দিদার বক্স মকবুলের কানের কাছে গলা নামিয়ে বলেন—কে রে গাড়োয়ান ? সিমার না ? মকবুল থেমে যায়। দাঁড়িয়ে পড়ে। কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। যেন সে ভয় পেয়ে গিয়েছে। ঈদ্রিশের কানেও একই বার্তা পৌঁছে দেন দিদার বক্স। ঈদ্রিশও থেমে পড়ে। ভয় পায়। এইভাবে মিজানও আয়াত থামায়। পা থামায়। ওদের খেয়াল হয়, সেক্রেটারি কী কথা বলছিলেন ! ওরা আর অগ্রসর হয় না। দিদার ওদের সাথে ক'রে সুখডহরির দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর গাঁয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করেন।

গিয়াসজী তখন গাড়োয়ানকে শুনিয়ে বলেন—গাড়ি দাঁড় করালে কেন ? চলো। দুই তালাক তো হয়ে গেছে। তুমি নিজে কানে শুনলে ! শোনো নি ? সুখবাসকে গিয়ে বলবে, আমি তিন তালাকই দিয়েছি। হ্যাঁ, বলবে। আর মাত্র এক ক্রোশ পথ বাকি। তুমি মদিনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা বাস ধরব। কী গো ছেলে, পারবে না ? চালাও গাড়ি !

গাড়োয়ানের গলায় কেমন কান্না আর আনন্দের মেশানো বিকৃত স্বর। অবুঝের আদিম আনন্দ যেমন। ভাষাহীন চাপা উল্লাসের আদিমতা। গরুর পিঠে লাঠি ভাঙে সে। গরু জোড়া লাফিয়ে ছুটতে থাকে। আবার গুঞ্জন শুরু হয়। আয়াত গুঞ্জরিত হয়।

কিছুদূর এসে ফের গাড়ি থেমে পড়ে। গাড়োয়ান নেমে পড়ে। অন্ধকারে পেছনে চেয়ে দেখে ওরা কোথায়। ওদের চিহ্ন দেখা যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে।

সহসা লণ্ঠন হাওয়ার ধাক্কায় নিভে যায়। নিভে যাওয়ার আগে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়োয়ানকে মুহূর্তে কেমন চেনা মনে হয় গিয়াসজীর। চকিতে মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। ভাবেন, তিনি ভুল দেখছেন। নাম ধরে ডাকবেন কিনা বুঝতে পারেন না। তিনি প্রবল আকুতি মিশিয়ে বলেন—চলো বাবা। আর মাত্র একক্রোশ পথ। বায়েন তালাক এখনো হয়নি। তুমি সেটা শুনবে। ওরা তো পালিয়ে গেল। শোনার ভয়ে পালালো। সাক্ষীর ভয়ে পালালো। তুমি শুনবে! তুমি সাক্ষী থেকো। বায়েন তালাকে এক সাক্ষী, নাকি কোনো সাক্ষী নেই বাপরে। কিছুই যে বুঝছি না। আসমানের ফেরেস্তা দেখছে, আমার ছেলে মদিনাকে স্পর্শ করেনি। আঘাত করেনি। সুখবাসকে বলবে তুমি। গিয়ে বলবে জাহেদা বেঁচে আছে। আমার মেয়ে মরেনি। বলবে তো? গাড়োয়ান?

হাহাকার ক'রে ওঠেন গিয়াসজী। দ্রুত আয়াত পড়তে থাকেন। মদিনা ফেটে কেঁদে ওঠে। ঠিক তখনই সুখবাস অদ্ভুত বিকৃত ভয়াবহ গলায় কেঁদে ওঠে অন্ধকারে। পুরুষের বিকৃত গলায় কান্না চেনা যায় না। চরাচর কী অসম্ভব কালিমায় ভরে আছে। গিয়াসজী সচকিত প্রশ্ন করেন—কে তুমি বটে?

গাড়োয়ান কান্না থামিয়ে উত্তর করে—আই ডোণ্ট নো। তারপরই হো হো ক'রে হেসে ওঠে। হেসে উঠেই অন্ধকারে ছুটে যায়। হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে এবং নিজেকেই প্রশ্ন করে—কে বটে তুমি! নিজেই উত্তর দেয়—আই ডোণ্ট নো। তারপর ছুটতে শুরু করে। ধোঁকায়। হাঁপায়। থামে। প্রশ্ন করে। উত্তর দেয়। এবং থামে না। ছোটে। ছুটতে থাকে। পাগল সুখবাস নিঃসীম গহন অন্ধকারের অস্তিত্বে দ্রুত ধাবমান এখন।

ঈশা গাড়ি ছেড়ে দেয়। বাকি ক্রোশ শেষে শুধায়—তালাক দিব চাচা?

গিয়াসজী কড়া গলায় জবাব করেন—না। দিও না।

গাড়ি চলতে থাকে। মদিনা ঈষৎ ব্যাকুল গলায় ডুকরে কাঁদে। তখন আয়াতের সুরকে মনে হয় শোক-সংগীত। একটি অন্ধকারের পারাবার পার হতে থাকে গাড়ি। দিক-চিহ্নহীন।

নাস্তিক

ধন্যবাদ হে অমর হাদিস, ধন্যবাদ বিশ্ব-কুরান ! হে মৌলভী মৌলানা, হাফ মোল্লা, ফুল মোল্লা আপনাদের সকলকেই হাজার শুকরিয়া।

ধন্যবাদ এইজন্যে যে, এ কাহিনীর আসল স্রষ্টা তো আপনারাই—আপনাদের মছলা মোতাবেক, শলা-সওয়াল-মাফিক যতদূর সম্ভব আমি এই কাহিনীর কথকতা করছি মাত্র।

ভাগ্যিস আমি ধর্মে মুসলমান, আমার পিতামাতা মুসলমান, হামিদুল এবং রাবেয়া, তারাও তো মুসলমান, তাদের পিতামাতাও পরহেজগার সুন্নী, অতএব এ গল্প এই শর্ত ছাড়া কোনোভাবেই শুরু হতে পারত না।

আমি যদি হতাম হিন্দু, রাবেয়া যদি হতো শর্মিলা, হামিদুল যদি হতো নির্মল কিম্বা অনিমেষ—তবে কি এ-কাহিনী সৃষ্টি হতে পারত ?

কস্মিনকালেও আর যাই হোক, রাবেয়াকে নিয়ে তিন মাস আমি যে ঘর করলাম, তা কি সম্ভব হতো ?

এই দেখুন, প্রথমেই ঘর করার কথা লিখে ফেললাম। আসলে আমার প্রথমেই ঘর-ভাঙার গল্পই বিবৃত করা উচিত, নতুবা হামিদুলের ষোল আনা চটে যাবার সম্ভাবনা। হামিদুল এমনিতেই হয়তো মনঃক্ষুণ্ণ হবে, তার এই লজ্জাকর, হয়তো খানিক কলঙ্কিতও বলতে পারি, কাহিনীর আদ্যোপান্ত আমার গোপন রাখাই কি উচিত ছিল না ? আমার দিক থেকে উচিত হয়তো ছিল, কারণ লজ্জা কি কেবল তার ? লজ্জা তো রাবেয়ার, আমারও। কিন্তু এ এমনই এক অবমাননাকর, লজ্জায় লজ্জিত চমকপ্রদ কিস্‌সা, যা গোপন করতে চাইলেও মানুষের কাছে গোপন থাকে না।

এত যে লজ্জা, তবু তো আমার পক্ষে এ-এক রোমাঞ্চকর নাটক যেন, আর সে কারণেই শুকরিয়া ! সে কারণেই আমার বেশ লাগে, ভাগ্যিস আমি মুসলমান ঘরে জন্মাতে পেরেছি।

কথাটা একটু ভেঙেই বলি।

ভাঙব, কিন্তু কোথা থেকে ভাঙি ? আমার হাতে এ যেন একটা রহস্যময় গোলাকার বস্তু, যার মুখ নেই, কিন্তু মোড়ক খোলামাত্রই যা এক ঝলকে ছড়িয়ে

পড়ে।

আমি জানি, সাধারণ কাহিনীগুলোর তিনটে ভাগ। গোড়ার ভাগে থাকে পাত্রপাত্রীর পরিচয় এবং তার পর মধ্যভাগ অব্দি তার শৃঙ্খলাপূর্ণ বিন্যাস, যেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে নাটক জমে ওঠে। আবার এমন কাহিনীও রয়েছে, যে কাহিনী মধ্যভাগ থেকে শুরু করে গোড়ায় আসে এবং তার পর শেষভাগে পৌঁছয়। আবার শেষ থেকেও কাহিনী শুরু হতে দেখেছি।

এ গল্পেও শেষভাগে একটা জায়গা আছে, যেখান থেকে শুরু করলে আমাকে এইভাবে শুরু করতে হবে—সকাল বেলা হামিদুল টাঙ্গা নিয়ে আমার বাসাবাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। আজ রাবেয়ার তিন মাস পূর্ণ হলো। এই তিন মাসে রাবেয়া যে সোয়েটারটা প্রায় বুনে শেষ করে এনেছিল, সহসা একটানে সমস্ত বুনন খুলে ফেলে দিল। আশ্চর্য এক চমকে চেয়ে দেখলাম, চোখের জলের মতো টলটলে একটি স্বপ্ন গাল বেয়ে গড়িয়ে গলে ঝরে পড়ছে। আমিই কি শুধু এই একটি স্বপ্নের বুনন দিয়ে একটা রহস্যময় গোলাকার বস্তু রচনা করেছি, যার মুখ নেই, কিন্তু মোড়ক খোলামাত্রই যা এক ঝলকে ছড়িয়ে পড়ে?

এভাবেও শুরু করা যেত। কিন্তু আসলে এ কাহিনীর শুরু মধ্যভাগ থেকে। এর গোড়ার কথা গোড়াতেই বলে নেওয়ার নিয়ম নেই।

আষাঢ় মাসের আজ ১৪ তারিখ। রেডিওর ঘোষণা মতো তিন-চার দিন আগেই বর্ষা নেমে যাওয়ার কথা। আকাশ এবং প্রকৃতি সে-কথা রাখেনি। আজ ১৪ তারিখ সন্ধ্যায় আকাশে গাঢ় হয়ে মেঘ জমল। চার দিক ঘোর অন্ধকার করে হাওয়া উঠল। প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির দানা আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল। তার পর ঘন হয়ে ঝরতে লাগল। সাঁই সাঁই টানা দমকা বেগ দিয়ে বর্ষার ঘন-ঘোর সংকেত বাজতে লাগল। আকাশে বিদ্যুৎ খেলতে খেলতে দিগন্ত ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে মেঘ ডেকে গেল। কোথাও বজ্রপাত হলো।

আমি দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়ে মোমবাতি জ্বাললাম। গাছপালা উপড়ে পড়ে বিদ্যুতের তার নিশ্চয়ই ছিঁড়ে গেছে। ঝড় বইছে টানা দু ঘণ্টা। ঘড়ি দেখে বুঝলাম, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। রান্নাঘর শোবার ঘরের সংলগ্ন। রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম, থালা ঢাকা দেয়া ভাত-তরকারি রয়েছে। ফুলমতি রান্না করে ঢেকে রেখে বর্ষার পূর্বাভাস বুঝেই বাড়ি চলে গেছে। ফুলমতি আমার ঠিকে ঝি।

একতলা বাড়ি। দুখানা শোবার ঘর। বৈঠক নেই। রান্নাঘর আছে। পায়খানা

আছে। বাড়ির সামনে এক চিলতে সবুজ মাঠ। বাগান করতে হলে প্রাচীর তুলতে হবে। একটা টিউবওয়েল আছে। ঘরে বিদ্যুৎ-বাতি রয়েছে। পেছনে দেয়াল-তোলা প্রাচীর। পুব-পশ্চিম খানিক বেড়ে রয়েছে, কিন্তু সামনের মাটিটুকু ঘিরে দেয়নি, ফাঁকা পড়ে রয়েছে। মালিককে বলেছিলাম—ঘিরে দিন। বাগান করব। মালিক বলেছে—ঘিরে নিন। ভাড়া থেকে কাটান হয়ে যাবে।

আবার একদিন বলেছে—কলেজে পড়াচ্ছেন! টাকা জমছে নিশ্চয়। পারেন তো কিনে নিন মাটিটা। বানানো ঘর পাচ্ছেন মশাই। অতি সুলভে ফাঁকার উপর এমন সৌধ দ্বিতীয়টি হবে না।

বলেছি, চাকুরিটা সদ্য সদ্য হয়েছে, টাকা জমতে সময় লাগে মশাই। সময় দিন।

মালিক আমাকে সময় দিয়েছে, বলেছে, বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করে দেওয়াই আমার ব্যবসা। আর একটা বাড়িতে হাত দিয়েছি, পয়সার খুব তাগাদা রয়েছে। তবু দিলাম সময়। বলি কি, টাকা জমিয়ে নয়, গাঁয়ে বাপের কাছে হাত পাতুন গিয়ে। কাঁচা ট্যাঁক পেয়ে যাবেন।

আমার হাসি পেল। হাসলাম। কিন্তু অনাবশ্যক মনে করেই মুখ ফুটে বললাম না, আপনি ঠিক বুঝবেন না, আমার বাপজান কতটা দরিদ্র। গ্রামের মানুষের কাছে ভিক্ষে করেই এক রকম আমায় পড়িয়েছেন। হামিদুল টাকা না পাঠালে আমার এম এ পরীক্ষাই দেওয়া হতো না।

আমার ঋণ সবার কাছে, কেউ হয়তো আমার কাছে ঋণী নয়। সবাই দেয় আমাকে, আমি কাউকেই কখনো দেওয়ার সুযোগ পাইনি, সংগতিই বা কোথায়? আজ অধ্যাপনার কাজ পেয়েছি, এ যুগে এই পেশাও ঠিক আর মানুষের আদর্শসম্মত নয়। এই পেশায় নিযুক্ত থেকে মানুষের ঋণ কতটুকু আর শোধ দিতে পারি? বিশেষ ঐ হামিদুলের ঋণ কি শোধ করা যায়? ভেবেছি, ওর বাচ্চা হলে, জানি না অ্যাদ্দিন তার বচ্চাকাচ্চা হলো কিনা, নিজের কাছে রেখে আপন সন্তানের মতো মানুষ করে দেব। হামিদুলকে একদিন কথাটা চিঠিতে লিখে জানাতে হবে। ভাবছিলাম, হামিদুলের সন্তান মানে তো রাবেয়ার সন্তান, রাবেয়া আমার প্রস্তাবে কখনো কি না করতে পারে?

পারে না।

হামিদুলও নিশ্চয় খুশি হবে।

বর্ষার এই উন্মত্ত প্রকৃতি, অঝোর বর্ষণের সন্ধ্যায় স্মৃতি বড় দুঃখ দেয়, আনন্দও।

এমন সময় দরজায় জোর ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। বাতাস কি ? হয়তো ঝড়। হয়তো মানুষ। এই ঝড়ে বাদলায় মানুষের খুব বিপদ না হলে সামান্য কারণে কেউ কি অন্যের দরজায় ধাক্কা দিতে আসে ?

দরজা খুলে দিলাম। ওরা চারজন জলের ছাটের সাথে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। ঢুকে পড়েই হামিদুল দ্রুত হাতে দরজা ভেজিয়ে খিল তুলে দিল। বাকি তিনজনের একজনকে চিনতে পারি, রাবেয়ার বড় ভাই এবং আমার সহপাঠী, রুস্তম। আর একজন বোরকা-পরা মহিলা। অন্য আর একজন সম্ভবত মৌলভী সাহেব, গাঁয়ের লোক, মোল্লাজিও হতে পারেন।

আমি রীতিমতো বিস্ময়-বিমূঢ়, হতবাক হয়ে গেছি। একটু আগেই তো আমি হামিদুলের কথা ভাবছিলাম।

হামিদুল সেই গাজীপুরের সিকদারের একমাত্র পোলা। আমার ছেলেবেলার বন্ধু, আমার যৌবনের প্রথম বেলার সবার বড় আত্মীয়। রক্তে নয়, বন্ধুতায়। সে আমার কি এবং কে, আর কি এবং কে নয়, তার হিসেব দিই কী করে ? কিন্তু এ কেমন ধারা হামিদুল, যাকে এক নজরে চিনতে এত কষ্ট হচ্ছে আমার। চেনা যায় কী উপায়ে ? চেহারায় বাইরের ঝোড়ো দুর্গতির ছাপ অন্তরেও কি স্বাভাবিক ? এক পলকেই মনে হলো, কোনো এক অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় সে আটকাতে পারেনি। সে মুচড়ে ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে।

বললে, এলাম। তোর কাছেই এলাম, একান্তই তোর কাছে। ভয় পেয়েছিস, না ?

বললাম, ভয় কিসের ? ভয় কেন পাব ? তোর তো আমার কাছে অ্যাদ্দিন একবারও অন্তত আসা উচিত ছিল।

—উচিত ছিল। ঠিক বলেছিস, উচিত ছিল। রাবেয়াও বলেছে, উচিত ছিল। আমারও মনে হলো—যাই। তোর কাছেই যাই। চলে এলাম। যা উচিত মনে হলো, তাই করলাম। কতটা ঠিক করেছি, তোকেই এখন ভেবে দেখতে হবে।

শুধালাম, রাবেয়া কেমন আছে ?

ওরা তিনজনই এক সাথে বোরকা-পরা মহিলার দিকে চাইল। হামিদুল খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল। বোরকা-পরা মহিলা এক টানে মুখের কাপড় সরিয়ে দিয়ে বললে, ভালো আছি বলেই তো ওদের সাথে অ্যাদ্দুর আসতে পেরেছি। চেয়ে দ্যাখ ; কী মনে হয়, ভালো নেই ?

রাবেয়াকেও চেনা যায় না। দু চোখ কেমন ফোলা ফোলা, মনে হচ্ছে অসুস্থ।

বললাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন তোমরা এভাবে, ঐরকম…

রুস্তম বললে, সুটকেসটা পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড় ছেড়ে আয় রাবেয়া। মৌলভী সাহেব! আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন। পরার মতো এক্সট্রা কাপড় আছে তোর কাছে, মামুন?

ওরা বাকি দুজন গামছায় মাথা হাত পা মুছে আলতো জড়োসড়ো হয়ে খাটে বসল। আমি দ্রুত পাশের ঘর থেকে ওদের তিনজনের জন্যই ধুতি পাজামা আর লুঙ্গি এনে দিলাম। রুস্তম লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরলে। হামিদুল পাজামা। মৌলভী সাহেব ভেজা লুঙ্গি ছেড়ে শুকনো লুঙ্গি পরে ফেললেন। ওদের পরবার মতো তিনটে পাঞ্জাবি দিলাম।

রাবেয়া পাশের ঘরে কাপড় বদলাতে চলে গেছে। মৌলভী সাহেব প্রশ্ন করলেন—আমায় চিনতে পার না? আমি শরীফ! গাজীপুরের খতিব।

বললাম, আপনি অনেক বুড়িয়ে গেছেন। আশ্চর্য! আপনিই সেই শরীফ সাহেব!

বললেন, হ্যাঁ, খতিব! আমার পীর হচ্ছেন ফুরফুরার হজরত কতুবদ্দিন সাহেব।

বললাম, ও, হ্যাঁ। মনে পড়ছে।

—পড়ছে? খুদা কী মেহেরবানি। না পড়ে উপায় নেই।

—কিন্তু!

—কিন্তু আর কি? আমিও এলাম ওদের সাথে। ওরা ছাড়ল না। হামিদুলের বাপও আমায় ঠেলে পাঠিয়ে দিলে। কথা হচ্ছে, ঐ যে ঔরৎ সাথে দেখছ, তিন মাসের জন্য আমরা ওকে তোমার এখানে তোমারই হেফাজতে রেখে যাব।

—কেন? চমকে উঠলাম।

খতিব সাহেব বললেন, তিন মাস। তার পর ফের নিয়ে যাব। এই তিন মাসের ভরণপোষণ তোমার। হাদিস মুতাবেক যেহেতু তোমরা আহ্‌লে হাদিস, ফরাজী। তাই তিন মাসে তুমি তিন তালাক দেবে। তিন হায়েজে তিন।

—তালাক দেব? আঁৎকে উঠি।

—হ্যাঁ। তালাক দেবে। তার পর আরো তিন মাস রাবেয়ার ইদ্দৎ।

—কিসের ইদ্দৎ? আমি বোকা হয়ে যাই।

—ইদদৎ কিসের জান না? হাদিস কুরান কিছুই বোঝ না দেখছি।

—না এসব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তোমার বুঝে কাজ নেই। তুমি মুসলমান, নাকি নাস্তিক? খতিব সাহেব হেসে ওঠেন। কেমন একটু বাঁকা, দুর্বোধ্য হাসি।

বললাম, ঠিক জানি নে। কী হলে আপনার উপকার হয় বলুন ?

তিনি বললেন, এতে আমার বিশেষ কোনো উপকার নেই। উপকার তোমার বন্ধুর।

হামিদুলের দিকে চেয়ে দেখলাম, সে কেমন কাতর চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। ভিখারি যেমন মানুষের করুণার দিকে আকুল হয়ে চেয়ে থাকে।

রুস্তম বললে, তুমি যদি নাস্তিক হও, আমরা তবে ফিরে যাব। যদি মুসলমান হও আমার বোন রাবেয়াকে আমি তোমার সাথে নিকে দিয়ে তিন মাসের জন্য তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যাব।

রাবেয়া পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে জল টলটল করছে। সে কথা বলল, নাকি কেঁদে উঠল, বোঝা যায় না।

বললে, ঐ মূর্খ আমায় জোর করে তালাক দিয়েছে মামুন। তোমার মতো নাস্তিক হলে, ওর তালাক খাটত না।

চেয়ে দেখলাম, হামিদুলের মাথা নিচু হয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। আমি ভালো করে রাবেয়ার দিকে চেয়ে দেখতে পারলাম না। শুধু কিছুক্ষণ নিস্পন্দ নির্বাক থেকে বললাম, শুনলেন তো খতিব সাহেব, রাবেয়া বলছে, আমি নাস্তিক।

খতিব সাহেব বললেন, সে কথা শিকদারও বলেছে। কিন্তু এ কথাও বলেছে, তুমি নাস্তিক কিন্তু নিমকহারাম নও। তোমাকে মানুষ বিশ্বাস করে।

ঘাড় তুলে হামিদুল আকুতি-ভরা চোখে আমার পানে তাকালো।

মুহূর্তে মনের মধ্যে তোলপাড় করে গেল। মাথার মধ্যে সমস্ত কোষগুলি নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগল। একজন মুসলমান অধ্যাপকের সমস্ত রুচি এবং সুস্থ সংস্কারের বৃত্তিবোধে চূড়ান্ত ঘা লেগে চৈতন্যের ভূ-ভাগ জোর প্রকম্পনে আন্দোলিত হতে লাগল। হামিদুলের দিকে চেয়ে দেখতে ঘৃণা বোধ হচ্ছিল। রাবেয়ার শুকনো-সজল মুখে চোখে চেয়ে অন্তরাত্মা শিউরে শিউরে উঠছিল, তার করুণা-পীড়িত মুখচ্ছবি দেখতে দেখতে মনে হলো, নিজেকে যদি মুসলমান বলি, এর চেয়ে লজ্জাজনক পরিচয় সভ্য মানুষের কাছে আর কিছু নেই।

কিন্তু আমার এ সময় নাস্তিক হয়ে ধর্মদ্রোহিতারও কোনো মানে হয় না। এভাবে রাবেয়াকে তার দুর্গত বিপন্ন জীবন থেকে রক্ষা করা যায় না। নেমকহারাম নই, অকৃতজ্ঞ নই, এই সত্যের উপর বিশ্বাস করে যে হামিদুল আমারই শরণাপন্ন, তাকে কি লাথি মেরে ফেরাতে পারি ? জীবনে কখন কবে ছেলেবেলায় ধর্মানুরাগে বশীভূত ছিলাম, তা যেন আজ মধ্যযুগের স্মৃতি, বিবর্ণ তৈলচিত্রে বাঁধানো।

গণতান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষায় লালিত যে মানুষ, তার জন্য এ-রকম শাস্তি আর হাদিসী জুলুম কত যে পীড়াদায়ক এ-সময় হামিদুল নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারবে না। ধর্মশাস্ত্রে আমার ঘোর উন্নাসিকতার দুর্নাম গাজীপুরে এক সময় আন্দোলন তুলেছিল। আশা করি, কেউ তা বিস্মৃত হয় নি।

আজ যে হাদিস আদিমযুগের কুসংস্কারের ডিপো হয়ে উঠেছে, তার নিগড়ে আধুনিক সভ্য-মন বাঁধা পড়তে পারে না। অথচ এ বাঁধন আজ অক্টোপাসের মতোই আমাকেও জড়িয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। কেমন ভয় পেয়ে আমি সহসা গর্জে উঠলাম, এ যে সাংঘাতিক পাপ! প্রচণ্ড ভণ্ডামি খতিব সাহেব। হামিদুল বললে নিচু স্বরে, হ্যাঁ, আমি ভণ্ড, মামুন! এ তো আমারই পাপ। তুই প্রায়শ্চিত্ত করে দে ভাই!

খতিব সাহেব বললেন, হামিদের পাপ, তোমার পুণ্য মামুন।

শুধালাম, আর রাবেয়ার কী?

বললেন, তার দুর্ভাগ্য! বদ্‌নসীব:

রাবেয়া ডুকরে কেঁদে উঠল।

হামিদুল অবরুদ্ধ গলায় বলে উঠল, তুই তো রাবেয়াকে একদিন ভালোবেসেছিলি মামুন! বিয়ে করতেও চেয়েছিলি। তোর সাথে বিয়ে হলে আজ তার আর এই দশা হতো না।

রাবেয়া আরো জোরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। রুস্তম চেঁচিয়ে উঠল, তুমি থাম তো হাদিম! আর অত আদিখ্যেতা দেখিও না। অন্যায় করেছ, সে কথা ঢাক পিটিয়ে না বললেও চলবে।

হামিদুল কেমন বিহ্বল হয়ে চুপ করে গেল। আস্তে আস্তে তার মাথাটা ফের বুকের উপর ঝুলে পড়ল।

বাইরে বৃষ্টির দাপট কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়েছিল। আবার চেপে এল।

বললাম, হ্যাঁ হামিদুল, ভালোবেসেছিলাম। সেই খুব ছেলেবেলায়, আমরা তিনজনে কতদিন বর-কনে খেলেছি। একদিন তুই আমার শ্বশুর হয়ে রাবেয়াকে মেয়ে বানিয়ে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিস তো, অন্যদিন আমাকে তোর শ্বশুর হতে হয়েছে। কতদিন এই বিয়ে-বিয়ে খেলতে গিয়ে তোর সাথে মারামারি করেছি, মনে পড়ে?

হামিদুলের নিশ্চয়ই মনে পড়ছিল।

বললাম, শ্বশুর হওয়ার চেয়ে বর হওয়াতেই আমরা বেশি সুখ পেতাম। সহজে কেউ মেয়ের বাপ হতে চায়? তোর গায়ে জোর বেশি, তুই পর পর দু-তিন দিন বর হয়ে আমায় জোর করে শ্বশুর করে দেওয়াতে আমার মন খারাপ

হতো। রাবেয়া বলত, হামিদ আজ তো তোমার শ্বশুর হওয়ার কথা, বর হচ্ছ কেন ? আমি আজ তোমার মাগ হব না। হা হা হা ! মনে পড়ে ?

বললাম, তার পর কতক্ষণই বা বর-কনে খেলা। খেলা ভেঙে যেত ! তিনজনে গলা মিলিয়ে ছড়া গাইতাম। হেলাফেলা হয়ে এল মামুর বিয়ে ভেঙে গেল ! রাবেয়া বলত, মামু নয় মামুন ! হামুর বিয়ে বল না কেন ? আমি আর হামুর ভাত খাব না মামুন ! আমি তোমার ভাত খাব ! ...তুচ্ছ একটা খেলা। খেলতে খেলতে, যতক্ষণ মন বসে খেলি, খেয়াল হলেই ধূলিখেলা সাঙ্গ করে দিই। কেতাব কুরান, হাদিস-পুঁথি, কালমা-কলম সবই ঐ খেলারই নিমিত্ত মাত্র।

খতিব বললেন, ঐ নিমিত্তের জোরেই আজও এই মুসলমান সমাজটা টিঁকে আছে।

বললাম, টিঁকে নেই। জোর করে টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে। একদল মোল্লাগাজী মৌলানার খেয়াল আর স্বার্থপরতার হাতে ঐ নিমিত্তকে সুবিধাবাদের অস্ত্ররূপে তুলে দেওয়া হয়েছে। হজরতের ধর্মে আজ আর প্রাণ নেই খতিব সাহেব ! আপনারাই তাব গলা টিপে নিঃশেষ করেছেন। প্রাণটা উবে গেছে, এখন শিকলটাই পড়ে আছে, আজ মানুষ সেই শিকলেরই স্তবগান করছে, অনুশাসন আর বাইরের প্রথা-কানুন, তার জোরেই সেই গাজীপুর থেকে এই দুর্যোগের রাতে দুটি নরনারীকে আপনারা এতদূর ছুটিয়ে এনেছেন।

খতিব সাহেব রেগে ওঠেন, জানতাম তুমি নাস্তিক। তুমি ধর্মের দোষ দেখ, কিন্তু যে নিজের থুতু রাস্তায় ফেলে জিভ দিয়ে চেটে তোলে, তার দোষ দেখ না ! তার শাস্তি হওয়া উচিত নয় ?

বললাম, শাস্তি কি ইদ্দৎ-পালন ? একটি বৈধ সুন্দর নারীজীবনকে বেশ্যাবৃত্তির পাঁকে নিক্ষেপ করা ? তার দোষ কোথায় ? নারী কেন শাস্তি পাবে ?

খতিব বলেন, চোর না শোনে ধর্মের কিস্‌সা। ইদ্দতের তাৎপর্য বোঝার তোমার সাধ্য কি মামুন ? শুনেছি, তুমি কলেজে হিন্দু নরনারীর অবৈধ মুহব্বতের নাটক কিস্‌সা পড়াও। হিন্দু নরনারীর জেনাকে বল প্রেম, তাদের অবাধ মেলামেশাকে বল প্রগতি ! বেপর্দা মেয়েদের নিয়ে কারবার তোমার।

বললাম, পর্দার আড়ালে রেখে নারীর ইজ্জৎ লুট করার মন্ত্র ঐ নাটক-কিস্‌সায় নেই খতিব সাহেব। সেখানে নারীর মর্যাদার কথা লেখা রয়েছে। আপনার সাথে তক্ক করে, বাহাস করে লাভ নেই। বরং যা করতে এসেছেন করে যান।

রুস্তম বললে, তাই করুন খতিব সাহেব। নিকেটা পড়িয়ে দিয়ে চলুন উঠে পড়ি। বাজে তক্কে সময় নষ্ট হবে।

খতিব বললেন, তা বলে লেখাপড়া শিখেছে বলে সে আমার ধর্ম তুলে অপমান করবে ?

রুস্তম বললে, সে তো অপমান করেনি। সে তার আপন মত বলেছে, আপনি আপনাব কথা বলেছেন, এতে অপমানেব কি আছে ?

—নেই ? সে নাস্তিকের মতো আচবণ কবছে। জানতাম সে তা করবে। কিন্তু শিকদারের কথা ঠেলতে পারলাম না, নইলে গাজীপুরে কি লোক ছিল না ?

রুস্তম বললে, নিশ্চয় আপনার পছন্দ মতো লোক ছিল বৈকি ! কিন্তু তাদের উপব হামিদুলের ভবসা ছিল না।

খতিব বললেন, হামিদুলের উপরও কি ভরসা করা যায় ? সে তো মস্ত হঠকারী। আমার ইচ্ছে ছিল তারিকৎ হাজীর সাথে রাবেয়ার নিকে হয়ে যাক। বুড়া হাজী এই জিন্দেগীতে আর রাবেয়াকে ফেরত দিত না।

রাবেয়া সহসা বলে উঠল, আমাব সেই ভালো ছিল খতিব সাহেব ! ঐ পাষণ্ড বর্বরের সংসারে আমার আব ফিরে যেতে এতটুকু প্রবৃত্তি হয় না। হামিদুল একবার চমকে উঠে রাবেযার ক্রুদ্ধ অপমানিত নিঃসহায় চোখের দিকে চেয়ে দেখে চোখ নামিযে বুকের উপর মাথা এলিয়ে দিল. মনে হলো ঘাড় থেকে মাথাটা এক কোপে কে যেন ঝুলিয়ে দিয়েছে।

আমি খতিব সাহেবের কথার সূত্র ধরে বললাম, আমিও যদি রাবেয়াকে ফেরত না দিই !

হামিদুল মাথা তুলল। এত করুণ, এতটা পুড়ে যাওয়া মুখচ্ছবি কখনো দেখি নি। এ যেন এক বৃদ্ধের প্রতিমূর্তি, অন্তর্দাহে ঝলসিত, বজ্রপাতে দগ্ধ মর্মাহত খাঁ খাঁ তাল-তমালের শুখা-শূন্য চেয়ে-থাকা দিগন্ত, চেয়ে দেখলেই বুকটা খালি হয়ে যায়।

সে বললে, ফেবত না দাও, কখনো জোর করব না। রাবেয়া তো তোমারও, তুমিও তাকে নিচ্ছ, এই ভেবে আমি কি সান্ত্বনা পাব না ?

বললাম, দেখছেন খতিব সাহেব, ড্রামা, মানে নাটক কেমন জমে উঠেছে। আসলে ও ফেরত পাবার আশাতেই আমার কাছে এসেছে, ফের বলছে সান্ত্বনার কথা। তুই কখনো নিজেকে এতটুকু চিনতে পারিস নি হামিদুল ! যে দুঃখ এতটুকু সইবার যো এবং যোগ্যতা নেই, তুই বরাবর সেই দুঃখকে আপন দোষে বয়ে এনেছিস।

রুস্তম বললে, মানুষ তাই নিয়ে আসে। নিজের দুঃখ নিজেই বয়ে আনে। এই তার আসল ট্রাজেডি। মুসলমানের তালাকের মধ্যে পুরাতন সেই গ্রীক ট্রাজেডির একটা পাকা রস রয়েছে—চরিত্রের চোরা দুর্বল ছিদ্র পথ ধরে অদৃশ্য জীবাণুর

মতো সেই ট্রাজেডির অনুপ্রবেশ ঘটে। আমি এ কথা অনেককেই অনেকদিন বোঝাতে চেয়েছি। যাই হোক। সেই এক ট্রাজেডির বোঝা আমরা আজ তোমার কাঁধেও চাপিয়ে দিতে চাই, প্রফেসর!

আমি চমকে সচকিত হলাম। বাইরে বৃষ্টি এতক্ষণে থেমে এসেছে। হয়তো রেণু-বৃষ্টি হচ্ছে। মোমবাতি পুড়ে গলে শেষ হয়ে এল। পাশের ঘরের তাকে মোমবাতি, মোমবাতির বাণ্ডিল রয়েছে।

রাবেয়া বলল, মোমবাতি কোথায় বল, নিয়ে আসছি। বরং পাশের ঘরের মোমটাই ততক্ষণে নিয়ে আসি। ওটা অতটা পোড়েনি। রাবেয়া আপনা থেকে তাক চিনে ও-ঘরের জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে করে, অন্য হাতে আরো দুটি তাজা মোম নিয়ে ফিরে এল।

আমি বললাম, আমার এই প্রথম বিয়ে করা, অথচ ছেলেবেলার বর-কনের খেলাধূলায় যে বিয়ে হতো, আজকের এই বিয়েও যেন তাই। তবুও প্রথম, মানুষ বলবে, এ এক সত্যকার বিয়ে। এ বিয়েতে আমার কী কী খরচ হবে বলুন!

রুস্তম বললে, কিছুই না। সেই খোলামকুচি, পিটুলিপাতার নোট আর জিভে চুক চুক করে নকল ভোজ খাওয়া। অবিশ্যি তুমি এখন আমাদের তিন কাপ সত্যিকার চা করে দিতে পার না?

রাবেয়া টি-পয়ে মোম বসাচ্ছিল। বললে, ঠিক আছে, আমি চা করে দিচ্ছি। বলেই সে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল। আমি বললাম, চা কোথায়, চিনি কোথায়, তুমি তা জানবে কী করে? দাঁড়াও, আমি দেখে দিচ্ছি।

সে বলল, তোমার আর কষ্ট করে উঠে আসতে হবে না! সে আমি দেখে নিচ্ছি।

—স্টোভে তেল নেই।

—টিনে তো কেরোসিন রয়েছে! বললে রাবেয়া।

বললাম, তা আছে।

হামিদুল বললে, এই তিন মাস, তোর কোনো কষ্ট হবে না মামুন। দেখে নিস! রাবেয়া যে পাক্কা গিন্নি, সে তো বর-কনে খেলার সময়ই আমরা বুঝেছিলাম! আজ পাঁচ ছ বচ্ছর বিয়ে হলো, ঘরকন্নার কাজে রাবেয়ার তিলার্ধ পরিমাণ ত্রুটিও চোখে পড়েনি।

বললাম, তবে ওকে তালাক দিলি কেন?

রুস্তম বললে, সে কথা তোমাতে আমাতে একটু আগেই আলোচনা হয়ে গেছে।

বললাম, তবু তালাকের একটা প্রত্যক্ষ কারণ থাকে; আমি সেই কথা

বলছি।

রুস্তম বললে, সে কারণ জেনে কী লাভ ? রাবেয়ার কাছেই জেনে নিও।

হামিদুল বললে, আমিও কারণটা পষ্ট করে এখন আর বলতে পারি নে। কেন দিলাম ? তাই তো, কেন দিলাম ? আমি খুব পাপী রে মামুন। শয়তান ! হামিদুল কেঁদে ফেললে।

রাবেয়া চা নিয়ে এসে ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে বললে, তোমরা নিজে হাতে তুলে নাও। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। একাই আমি পাঁচখানা ক্রিম বিস্কুট খেয়েছি। তোমাদের একখানার বেশি ভাগে হলো না।

চা খেতে খেতে খতিব সাহেব বললেন, বিয়ে যখন, গুরুত্বটা বিয়ের মতোই হওয়া দরকার। তারও একটা গাম্ভীর্য লাগে। তোমরা সবাই ঠিক মতো স্থির হও। মামুন, তুমি ভালো পোশাক পরে এস।

রাবেয়া বললে, এতক্ষণে বুঝলাম কথাটা ! যে সাধের বিয়ে, তার পায়ে আলতা দিয়ে ! খতিব সাহেব, আপনি এ অনুষ্ঠানের যত মাহাত্ম্য বাড়াবেন, আমার বুকে ততই শেলের মতো বিঁধবে। এ জিনিস যে কত ছিনিমিনি, এ সমাজ আমাদের সে কথা মুখ ফুটেও বলতে দেয়নি।

বললাম, কিন্তু রাবেয়া, এই বিয়ে যে আমার সত্যি বিয়ে রাবেয়া, আমি তো এর আগে কখনো বিয়ে করিনি।

পরিবেশ আমার এই কথায় কেমন বিষণ্ণ আর গম্ভীর হয়ে উঠল। খতিব সাহেব বললেন, জানি, তোমার ঘরে টুপি নেই। নাও এই টুপিটা মাথায় পরে ফেল। বল, আছতাগ্-ফে-রুল্লাহা...

খতিব সাহেব দোয়া কালাম দিয়ে শুরু করে বললেন, মা তবালাকুম ! বিয়ে হচ্ছে চুক্তি, সোসাল কনট্রাক্ট। নরনারীর যৌন সম্পর্কের বৈধতাকে স্বীকৃতি দেয় যে চুক্তি, মা তবালাকুম, সেই চুক্তির নামই নিকাহ। এই চুক্তির জন্য চাই দেন্‌মোহর। এই দেন্‌মোহর সম্পর্কে দু ধারা মত রয়েছে। তাই আবু হানিফার মতে ন্যূনপক্ষে দু টাকা দশ আনা, অর্থাৎ দু টাকা বাষট্টি পয়সা দেন্‌মোহর কম্পালসারি, তার কমে চলে না। অবিশ্যি ইমাম শাফির মতে যৎসামান্য দেন্‌মোহরেও নিকাহ সিদ্ধ হতে পারে।

রুস্তম বললে, সে কথায় আমাদের কাজ কি শরীফ সাহেব ! যে ভাবে সম্ভব তাই করুন না কেন ?

খতিব সাহেব বললেন, দেখ বাপু ! হাদিস-কুরানকে উল্টে দিয়ে আমি তো এক পা-ও চলতে পারিনে। কেউ একজন ছেলেছোকরা মোল্লাজিকে ধরে আনলেই তো পারতে ! শিকদারকে তখনই বলেছিলাম, গাঁয়েই কারো সাথে

নিকে দিয়ে সাথে সাথে ছাড়িয়ে নিয়ে ফের হামিদুলের সাথে নিকাহ্ দিন। কিন্তু শিকদার আসল সুন্নী, তিনি তা শুনবেন কেন?

রুস্তম বললে, সবই ঠিক। শিকদারের কথা মতোই তো কাজ হচ্ছে। পান থেকে চূন তো কোথাও খসে নি। নিন শুরু করুন।

খতিব সাহেব শুরু করলেন, গাজীপুরনিবাসী তৈমুর মণ্ডলের কন্যা রাবেয়া খাতুনের সহিত দু টাকা বাষট্টি নয়া দেন্‌মোহরে উক্ত গ্রামবাসী আলামৎ সেখের পুত্র, তুমি মামুন রহমান...ইত্যাদি।

মন্ত্র পাঠ শেষ হলে, খতিব বললেন, নিকাহ্ সুসম্পন্ন হয়েছে। এবার আমি উঠব। কিন্তু হ্যাঁ, ওহে মামুন সাহেব, তোমার সাথে গোপনে আমার দুটি কথা আছে।

বলেই তিনি আউড়ে উঠলেন—'হাত্তা তন কি হা জওয়জন গাইরা হু...অর্থাৎ ইঁহা তককে দুসরা জওজাকো কবুল না করে তব্ তক আওয়াল জওয়জ জায়েজ না হোগা।'

আউড়ে যেতে থাকেন ফুরফুরা শরীফের কুতুবুদ্দিন পীর সাহেবের শিষ্য মৌলানা মুহম্মদ আবু শরীফ সাহেব। হাত্তা তন কি হা জওয়জন গাইরা হু...অর্থাৎ...। পাশের ঘরে এলাম। খতিব সাহেব ঢুকলেন

বললেন, এটাই হচ্ছে আসল খবর মিয়াজান। হামিদুলের সাথে রাবেয়া যেরূপ স্ত্রীর স্বাভাবিক আচরণ করেছে, ঠিক সেরকম অনুরূপ ব্যবহার তোমার সাথে করবে। অন্তত একটি রাত্রিও একই বিছানায় তোমাদের শুতে হবে, সহবাস করতে হবে।

বললাম, জানি, তবেই নিকাহ সিদ্ধ হবে, ইদ্দতের ষোলকলা পূর্ণ হবে। খতিব সাহেব মোলায়েম হেসে উঠে বললেন, এটাই হচ্ছে আসল খবর মিয়াজান! চলি ভাই! শর্তটা তোমায় বুঝিয়ে দিয়েছি, এবার চলি। ফের তিন মাস দশদিন বাদে দেখা হবে। চল হে রুস্তম, ভোর রাত নাগাদ নিশ্চয় আমরা গাজীপুর পৌঁছে যাব। চল, আর তো দেরি সয় না। ওহে হামিদুল, তোমার কোনো কথা থাকলে চট করে সেরে নাও ভাই! আর হ্যাঁ।তিনমাসেতিন। এই ফরমুলাটা মনে রেখো মামুন সাহেব! ফরাজী তুমি। আহ্‌লে হাদিস। চলি? মিঠে হেসে ঘাড় কাত করলেন খতিব।

হামিদুলের বিদায় আসন্ন হয়েছে। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে রাবেয়া ফুঁপিয়ে ফাঁপিয়ে উঠছে, এ এক আশ্চর্য দৃশ্য।

হামিদুল বললে, আমার এঁটো-চুক্ খেতে তোর কখনো আটকাত না জানি!

কিন্তু যে আম-পেয়ারা আধেক খেয়ে তোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতাম, খাস্ নে মামুন, ধরে থাক্ । গাছ থেকে আরো দুটি ডাঁসা পেড়ে আনি, মনে আছে তোর ? তুই কখনো তাতে দাঁত বসাতে সাহস পাস নি । কিন্তু আজ কি তোকে তেমন করে কোনো কিছু ধরে রাখতে বলতে পারি মামুন ?

বললাম, নারীও মানুষ হামিদুল, আম পেয়ারার মতো ভোগের পণ্য শুধু নয় । এই কথাটা তোকে বলতেও এখন আমার ঘেন্না হয় । যা, তুই আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা । পাষণ্ড ! জানোয়ার !

হামিদুল এমন-এক শুকনো হাসতে হাসতে বিদায় নিল, যার কোনো বর্ণনা দেওয়া মুস্কিল, মানুষকে অমন অপদার্থ কাঙালের মতো হাসতে কখনো দেখিনি ।

রাবেয়া সারা রাত পাশের ঘরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে আর মুখ তোলেনি । অন্য ঘরে, কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি ।

এইভাবে আমাব ফুলশয্যার বাদল রাত্রি কেটে গেল । ভোরে উঠেই প্রথম মনে পড়ল, রাবেয়া গত রাত্রে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল ।

দুই

রাত্রি হয়তো তিনটে নাগাদ আমি জেগেছিলাম । নিদেন দুটো আড়াইটা তো বটেই । কেমন এক দিশাহীন উত্তেজনা, বিহ্বল আত্মপীড়ন অনুভব করেছি । মনে হয় গত রাত্রিটা দুঃস্বপ্ন-কবলিত প্রেতচ্ছায়ার অভিনয় মাত্র, অথচ যা ছায়া শুধু নয় । মানুষের কাছে এই ঘটনা-অভিনয় বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাও কত-না মুশকিল ! সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের ধর্মীয় কুসংস্কারলালিত জীবনে প্রত্যহ যে নাটক অভিনয় হয়, আমি সে নাটকের নায়ক হতে পারি বলে কখনো কল্পনাও করিনি ।

কলেজ-লাইফে তালাক প্রথার বিরুদ্ধে কত-না যুক্তি এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছি । রেডিও-তে কলকাতা থাকার সময় কথিকা পাঠ করেছি । সব আজ কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয় । গ্রামের কথায় আছে এক পাপী পাপ করে, হাজার পাপী পুড়ে মরে ! হামিদুলের পাপ আমায় দগ্ধ করল ।

কিন্তু শুধু কি তাই ! আমার মনে কি রাবেয়ার জন্য আকৈশোর এক দুঃসহ লোভ মনের মধ্যে তৃষ্ণা এবং ভালোবাসার ছদ্মবেশে ঘাপ্‌টি মেরে এতদিন জর্জরিত করেনি ? কত নারীর সান্নিধ্য এ জীবনে সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তাতে কি

রাবেয়ার তৃষ্ণা সখ্য প্রীতি স্নেহ নিবারিত হয়েছে ?

আজও কেন বিয়ে করব বলে হাজার প্রস্তুতি মনের মধ্যে নিষ্ফল হয়ে গেছে, বাস্তবের সংসারে তার কোনো রূপায়ণ হতে পারে নি ? এই সব মনের অচেনা কামনার স্পষ্ট দিশে পাইনি বলেই তো কাউকে বোঝাতে পারি নি, রাবেয়ার রূপ মন থেকে মুছে ফেলে অন্য কোনো নারীর কল্পনা করা দুঃসাধ্য না হলেও, তাতে কোনো মনের তাগিদ ছিল না।

এই হয়, কার মনে কিসের সুদূর কামনা অস্পষ্ট হয়ে বসবাস করে, তার গূঢ় প্রকৃতি সে হয়তো সচেতন মনের ভাষায় নিজেকেই স্পষ্ট করে শোনাতে পারে না।

অনেক দিনই তো মন দিয়ে মনের অসম্ভবকে শাসন করেছি। বলেছি, রাবেয়া তোমার তো একার ছিল না। তার রূপে তার হৃদয়ে তোমার প্রথম যৌবনের আকুতি মিশিয়ে তোমার আপন ভালোবাসাকে তুমি আপন হাতে আঁকা ছবির মতো সেই কবে দূর অতীতের স্মৃতির ওপারে বসে প্রত্যক্ষ করেছিলে। আর একজনও, তোমারই পরমাত্মীয় হৃদয়ের বালক বেলা, সেই রূপে অস্তিত্বে বয়ঃসন্ধির কামনা বাসনায় শিল্পীর মতোই মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে রাবেয়ার আরাধনা এবং স্তবগান করেছে। সে দেহের ভাগীদার তুমি তো একাই ছিলে না। হামিদুলের পয়সা ছিল, সে সহজেই রাবেয়াকে কিনে নিয়েছে। তোমার মেধার বিনিময়ে সেই অসম্পূর্ণ অপ্রস্তুত সময়ে, (তখন তুমি অনার্স নিয়ে বি· এ· প্রথম বর্ষের ছাত্র) রাবেয়াকে দখল করতে পার নি। কিন্তু সেই কিশোরকাল আর বয়ঃসন্ধির অধিকারবোধ কত-না মারাত্মক ! সে সহজে একজন মানুষকে স্মৃতি ও কামনার হাত থেকে নিস্তার দেয় না, সহজে তার নিবৃত্তি নেই।

ভাবতে ভাবতে কেমন শিউরে উঠলাম আমি।

এমন সময় ফুলমতি এল।

কে জানে, রাবেয়াকে দেখে কেমনধারা প্রতিক্রিয়া হবে ! সে কি বিশ্বাস করবে, আমি সত্যিই বিয়ে করেছি।

রাবেয়া কখন কোন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেছে, স্নান করেছে। আমার ঘরে ধূপবাতি জ্বেলে দিয়েছে। চায়ের জল চড়াবার আগে থালাবাসন মেজে ঘষে ফেলেছে, ঘর ঝাঁট দিয়েছে।

রাবেয়ার ডান হাতে চায়ের প্লেট, বাঁ হাত ফুলমতির এক হাতের জামা আঁকড়ে ধরা। ফুলমতিকে টেনে নিয়ে এল সামনে। বললে, ফুলমতি তোমার ঝি ?

বললাম, হ্যাঁ ! কেন, কি হয়েছে ?

রাবেয়া খাটের মাথার কাছে টেবিলে ছড়ানো বইগুলো হাত দিয়ে গুছিয়ে দ্রুত ঠেলে দিয়ে চায়ের প্লেট রেখে বলল, বেশ হয়েছে ! বিয়ে করলে রাতারাতি, ঝি-কে একখানা কস্তা-পেড়ে কাপড়ও দিলে না !

বললাম, দু টাকা বাষট্টি পয়সার বিয়েতে ক পয়সার কাপড় দেওয়া যায়, তুমিই বল ?

রাবেয়া বললে, ক পয়সার বিয়ে মানুষ তা বুঝবে কী করে ? মানুষের পাওনা , মানুষকে দিতে হবে !

বললাম, দুপুববেলা তুমি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এস ! টাকা দিয়ে যাব ।

—কোথায় যাবে এখন ?

—কেন, কলেজ যেতে হবে না ?

—ও, তাই ?

বলেই রাবেয়া দ্রুত গলায় বললে, এই ফুলমতি, যা তো বুবু, সাহেবের জল তুলে দে !

ফুলমতি লজ্জা পাচ্ছিল, তবু যাবার সময় লজ্জার মাথা খেয়েই যেন বলল, একটা কথা বুলতাম সাহেব !

বললাম, বল কী বলবি ? শঙ্কিত হয়ে উঠলাম । ফুলমতি আমায় অবাক করে দিয়ে বলে উঠল, অ্যাদ্দিন এ বুবুমনি, কোথায় ছেল সাহেব, আসমানে ?

—কেন ? আসমানে থাকবে কেন ? এ তো মাটিরই দুলালী !

—না সাহেব, মাটিতে হুর থাকেনে, আসমানে থাকে । আল্লা তোমারে এত রূপই দিয়েছে বুবুজান !

ফুলমতির বাক্যি-ঢঙ নকল করে বুবুজান বললে—তা আর দেবে নে ! মনিব-পত্নী কি কখনও অসুন্দর হয় ? বেশ তো কস্তা-পেড়ে শাড়িই তুই পাবি ! হলো তো !

রাবেয়া হো হো করে হাসতে লাগল ।

দেখলাম, গত রাত্রির অসুস্থতা তার নেই । রূপ তার সত্যিই প্রজ্বলিত হয়ে নবনীর মতো বিগলিত হচ্ছে ।

ফুলমতি চলে যেতেই রাবেয়া শুধায়, তোমার কলেজ কটায় ?

বললাম, সে তো সুদূর এগারোটায় ।

রাবেয়া বিছানার পাশে বসে বলল—এগারোটা আর সুদূর কোথায়, আটটা বাজতে চলল । যাও স্নান করে এস । আমি ততক্ষণ গুছিয়ে নিই কিছুটা । দুপুরবেলা ঝুল ঝাড়তে হতো, আজ হবে না । ফেরার সময় বাজার থেকে ঝাড়ুনি এনো । না-হয়, আমায় কিছু টাকা দিয়ে যেও, টুকিটাকি অনেক কিছু কিনতে

হবে। চা ছাঁকবার ছাঁকনাটা একদম ফেঁসে গেছে, নুন রাখবার একটা কাঠের বাক্স দরকার। ফুলমতি বড্ড নোংরা, লঙ্কাগুঁড়োর কৌটোতে মাছের শুঁট্‌কি আর বড়ি রেখেছে। তুমি শুঁট্‌কি খাও ?

—না তো !

—তাই তো বলি, তুমি তো কখনো ওসব খেতে না !

বললাম, ওসব অখাদ্য ফুলমতির প্রিয় খাদ্য, আমায় লুকিয়ে রান্না করে ! আদুরে ঝিকে নিন্দে করতে পারি ?

রাবেয়া বললে, কিন্তু ওসব দেখেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। আচ্ছা তামাশা তো !

—হ্যাঁ, তাই। বলেই আমি হাসতে লাগলাম। হাতে প্লেট তুলে নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম।

চা খেতে খেতে চোখ তুলে দেখলাম, রাবেয়া নিষ্পলক হয়ে আমায় চেয়ে চেয়ে দেখছে, যেন সস্নেহে আমায় গিলছে।

বললাম, কী দেখছ অত ? সেই ছেলেবেলার মামুনকে চেনা যায় কিনা !

রাবেয়া বলল, ঠিক তাই ! তুমি কত শুকিয়ে গেছ ! ভালো করে খাও না বুঝি ! ঝিয়ের হাতে রান্না খেয়ে কি আর শরীর ঠিক থাকে ? আচ্ছা মামুন ?

—বল !

—সেই ছেলেবেলার একটা কথা তোমার মনে আছে ?

—কোন কথা ?

—সেই যে ! একবার নদীতে তুমি আর আমি মাছ ধরতে গেলাম, মনে আছে ?

বললাম, তা আর নেই, কতদিন আমরা গামছা ছেঁকে পুঁটি মাছ ধরেছি।

—নদীপাড়ে একটি দুটি জলভর্তি গর্ত থাকত আমাদের। মাছ ধরে আমরা সেই গর্তে রেখে দিতাম। মনে পড়ে ?

বললাম, পড়ে বৈকি ! কতদিন তোমার হাত থেকে মাছ ফস্কে গেছে রাবি, সেই অপরাধে কত মেরেছি ! একদিন তো...

—একদিন আমায় ছুটে মারতে গিয়ে তুমি পা ফস্কে নদীর পাড়ে পিছলে পড়ে গেলে। তোমার কপাল পাড়ের খোলামকুচিতে কেটে গেল। সে কী রক্ত ! নদীর জল লাল হয়ে গেছিল। আমার সে কী ভয় আর কান্না। তুমি যতই বল, কিছু হয়নি চুপ কর রাবি, ততই আমি চিৎকার করে কাঁদি। তুমি আমায় কিছুতেই থামাতে পারলে না। আমি কাঁদতে কাঁদতে কচুর ডাঁটা এনে কপালে আন্টিসেপ্‌টিক রস লাগিয়ে দিলাম। নদী থেকে উঠে এসে জামগাছের ছায়ায়

তুমি শুয়ে পড়লে। তোমার গায়ে হুহু করে জ্বর এল। মনে পড়ে ?

—পড়ে।

—তখন আমি কী করলাম, মনে পড়ে ?

—না।

—তখন আমি তোমায় জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম, মনে হলো···

—কী মনে হলো ?

—তুমি বোধ হয় মরে যাবে !

—ধেৎ !

—হ্যাঁ, তাই ! বিশ্বাস কর তুমি।

—এই মরে যাওয়ার কথাটা তোমার এখন মনে হচ্ছে। অতীতের সব কথাই তো আর ঠিক ঠিক মনে হয় না। বর্তমানটাও তার মধ্যে ঢুকে যায় !

—তুমি প্রফেসর ! তোমার কথাই হয়তো ঠিক ! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সেই ছেলেবেলার সব কথাই আমার হুবহু মনে পড়ে !

—কিন্তু সেই স্মৃতি-দুর্গে আজ প্রবেশ করে হৃদয়কেই শুধু রক্তাক্ত হতে হয়। ফর নাথিং আমরা কেবল বিপন্ন হই। রাবেয়া বললে, তবু সেই স্মৃতিই আমার জীবনের অধিকাংশ। স্মৃতিভুক এই অন্তরকে অ্যাদ্দিন তো এভাবেই রক্ষা করেছি মামুন !

বললাম, তোমার কথাগুলো সাহিত্যের মতো সুন্দর !

রাবেয়া বললে, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় বাংলায় আমার সিক্সটির উপর মার্কস ছিল ভুলে যাওনি বোধ হয়। ১৬ বছর বয়সেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি গলাধঃকরণ করেছি, অত সাত তাড়াতাড়ি পেকেছিলাম কি সাধে ?

—তাই ?

—হ্যাঁ মশাই ! ঠিক তাই।

রাবেয়া মাথা কাত করে মৃদুস্বরে হাসতে লাগল।

বললাম, তার পর তোমার তো আর কলেজে পড়া হলো না।

রাবেয়া বললে, হবে কোত্থেকে ! তুমি কলেজে এক বছর আগে ভর্তি হয়েছিলে, পরের বছরই আমার কলেজ যাওয়ার কথা। পাশও করলাম। কিন্তু সাথে সাথে হামিদুলের সাম্রাজ্যবাদী আচম্বিত আক্রমণ এবং জোরদখল, সবই বরাত ! নসিব !···সবই তো জানতে তুমি। আমার বিয়ের খানাও তুমি খেয়েছিলে, হামিদুলের পাশে বরের দোসর বসেছিলে। শুনেছি, এমনই তুমি সেজেছিলে, লোকে তোমায় বর ভেবে ভুল করছিল। তাই কিনা বল ?

বললাম, তাই। ঠিক তাই। লোকে ভুল করছিল, ভাবতেই পারেনি, আমার

সাথে তোমার বিয়ে হচ্ছে না। গাঁয়ের লোক এক রকম স্থির করেই ফেলেছিল···

রাবেয়া বাধা দিয়ে 'বাদ দাও ওসব কথা'—বলেই উঠে দাঁড়ালো। বললে, এতক্ষণ জল দেওয়া হয়েছে, চল স্নান করবে, চল।

আমিও উঠে পড়লাম।

খেতে বসে ফের সেই অতীত জীবনের স্মৃতিকে টেনে টেনে তুলতে লাগল রাবেয়া। খাবার থালায় পাখার বাতাস দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে সেই স্মৃতির দিকে চোখ ফেরানো।

সে তলিয়ে যেতে চায় আমাকে নিয়ে, কিন্তু গহনে নামতে ভয় পায়, তার যেন দম আটকে আসে। সে আমাকে পাতালের দিকে ঠেলে দিয়ে ভোঁস করে স্মৃতির উপরিভাগে জেগে উঠে নিশ্বাস টানে। তখন আমি গভীর সমুদ্রে, বড় একা মনে হয়। তার এই অদ্ভুত স্মৃতি-চর্চার জন্য তাকে রহস্যময় এবং নিষ্ঠুর মনে হয়।

এই ভাবেই স্মৃতি-কণ্টকিত অস্থায়ী দাম্পত্য জীবনের দিন-রাত্রিগুলি প্রবাহিত হয়, দ্রুত এবং স্বস্তিহীন, কখনো বা মধুর এবং স্বপ্নমাখানো।

দিন যত ফুরিয়ে আসে, আমি তত অস্থির হয়ে উঠি।

তিন

দাম্পত্য জীবনের মিঠে-অম্লমাদক রসে এক ধরনের স্বাস্থ্যকর অনুভূতি আছে, বিশেষ যখন ভালোবাসার রূপবতী কন্যাটি দিনরাত আমারই ভালোমন্দের হিসেব নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে রয়েছে।

টুকিটাকি গৃহের আসবাব, চা-চামচ, চিনি, টুথপেস্ট, চিরুনি, এমন কি একটা সোয়েটারের উলের বল এই সব অতি তুচ্ছ আয়োজন দিয়ে রাবেয়ার গৃহিণীপনার আর্ট যে রকম পল্লবিত হতো, বালিশের ওয়াড়, টেবিলের নকশা তোলা ঢাকনা-চাদর, ধনে-মৌরীর ভাজা মসলার ছোট্ট কৌটোটির সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার পরিচ্ছন্নতা, আমায় বিস্মিত না করে পারেনি।

গৃহিণীর গাম্ভীর্য আর প্রসন্নতা, স্ত্রীর আদুরে গলার নানা ভাববাচ্যের সম্বোধন এবং আবদার, সমস্ত ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্যে কোথাও কখনো জল্লাদ-রূঢ় ভাব দেখতে পাইনে।

একদিন বললে, সোয়েটারটা এই বেলা শুরু করে দিই, সামনে শীতে গায়ে পরবে তুমি, আমি তখন আর থাকব না। আমার হাতে-বোনা সোয়েটার থাকবে। একটু একটু বুনে তুলব রোজ, পাখি যেমন নারকেল গাছে উল্টো কুঁজোর মতো বাসা বুনে তোলে। বাবুই পাখির নামটাও চমৎকার! কিন্তু বাসাটি

এমনই ঝুলে থাকে, আমাদের জীবনের মতোই অস্থায়ী ভঙ্গুর এবং অনিশ্চিত চেয়ে দেখতে ভয় পাই, তুমি পাও না ?

বললাম, তোমার কথাগুলো গল্পের মতো সুন্দর।

রাবেয়া বললে উলের কাঁটা চালিয়ে, গল্পই তো ! জীবন মাত্রই কোনো না কোনো গল্পের পাঠ। প্রত্যেক মুসলমান নারী-জীবন এক একটি উপন্যাস। শরৎবাবু লিখেছিলেন, হিন্দু বিধবাদের নিয়ে, তেমন কেউ নেই, যিনি আজকের তালাক নিয়ে লেখেন, মুসলমান মেয়েদের অন্তর্বেদনার ছবি আঁকেন ! গ্রামে যাও, দেখবে প্রায় প্রত্যেক ঘরেই ছিনিমিনি চলছে। দরিদ্রদের মধ্যে তালাক যেন ডালভাত হয়ে গেছে, কথায় কথায় তালাক, গালিগালাজের মতো অবলীলায় উচ্চারিত হয়। আমরা মেয়েরা বুঝে পাইনে, বিংশ শতাব্দীর ফুরিয়ে আসা সাঁঝবেলাতেও সত্যিকার মুসলমান জাতটা কোথায় রয়েছে !

বললাম, তুমি সাহিত্য করলে অনেক ভালো করতে রাবেয়া !

রাবেয়া সে কথায় কান না দিয়ে বললে, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, মুসলমান পুরুষ কতখানি পশ্চাদ্‌পদ, ধর্মের আদিম সংস্কারে মনটা বিকল হয়ে রয়েছে, ধমনীর রক্তে তাদের একটা জিঘাংসার নেশা লেগে থাকে, আরব্য উপন্যাসের বাদশা সব এক একটা !

বললাম, আজও অ্যারাবিয়ান নাইটসের শাহাজাদী যেন গল্প শুরু করতে পারে, অধুনা তুমিই সেই উজির-কন্যা শাহাজাদীর নব্য সংস্করণ।

রাবেয়া চোখ তুলে বললে, ঠাট্টা করছ ! করবে নাই বা কেন ? তুমি তো সেই পুরুষই !

আমি বোকার মতো হাসতে হাসতে বললাম, আত্মপক্ষ সমর্থন করে তোমায় একটা কথা বলি রাবেয়া।

রাবেয়া বললে, তুমি কি বলবে জানি ! বলবে, এমন কিছু মুসলমান ছেলেও রয়েছে, যারা কুসংস্কারমুক্ত, সভ্য এবং মুসলমান মেয়েদের প্রতি করুণাপরায়ণ !

—করুণাপরায়ণ বলছ কেন ? তারা কি মেয়েদের দুঃখ বোঝে না ?

—বোঝে বৈকি ? এই তো তোমার বন্ধু, টাকার জোরে আমায় জবর-দখল করে আমার মনের সব দুঃখ মোচন করে দিয়েছে। সে কি আমায় কোনো মুহূর্তে এতটুকু বুঝতে চেষ্টা করেছে ?

বললাম, সে-ও কি তোমায় আমারই মতো আশৈশব ভালোবাসে নি ? আমরা দু জন তোমার ভিতর দিয়ে একটি পূর্ণ এক ও অভিন্ন সত্তার মতো নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পূর্ণতা খুঁজেছি।

রাবেয়া বললে, তুমিও কম সুন্দর কথা বল না। কিন্তু তা শুনতেই সুন্দর,

আসলে তা মস্ত ফাঁকির কথা। ভালোবাসার ধর্মই হচ্ছে এক হয়ে ওঠা, কিন্তু এক হতে চাইলেই কি পূর্ণ এক ও অভিন্ন সত্তা হওয়া যায়, না, মানুষ তা পারে ? ধর্মে রুচিতে সংস্কারে, মতে আদর্শে, এক না হয়ে ভালোবাসায় এক হওয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা।

বললাম, ওটা একটা বইতে পড়া তত্ত্বকথা।

রাবেয়া বললে, সে তত্ত্বকথা তুমিই শুরু করেছ। 'পূর্ণ এক ও অভিন্ন সত্তা', কথাটা কি আমার ? ভেবেছিলে, তোমরা দিনে দিনে এক হয়ে উঠছ, কিন্তু যত দিন গেছে, বাইরে বাইরে এক হয়ে থাকলেও অন্তরের ব্যবধান বেড়েই গেছে। যে সংসারে হামিদুল মানুষ, সেখানে পুঁতি-পাঁকে কেবলই ধর্মের কুসংস্কার আর তার কোলাহল। মন সেখানে স্বাভাবিক স্বাধীন স্ফূর্তি ভুলে সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। তোমার সাথে ব্যবধান তো বাড়বেই।

বললাম, তবু আমরা এক ছিলাম। তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না, ঠিক কেমন এক ছিলাম একদিন।

রাবেয়া বললে, একদিন ছিলে বৈকি ! নিশ্চয় ছিলে। কিন্তু যত দিন গেছে, তোমরা দুজনই আপন গতিতে তিলে তিলে ক্রমশ নিজেদের বদলে তুলছিলে। টের পাও নি। বন্ধুত্বের রঙ পাছে ফিকে হয়ে পড়ে, তাই মানুষ এই পরিবর্তনের কথা ভেবে ভয়ে তা গোপন রাখে, নিজের কাছেও সে কথা খুলে ধরে না, আত্ম-বিচার করে না।

বললাম, তুমি এ-সব জানতে ?

রাবেয়া বললে, এ-সব লক্ষ করতাম ! না হলে ভালোই যদি বাসতে পরস্পর, আমাকে ঘিরে যদি স্বপ্নই ছিল, এক সত্তা এক প্রাণ হয়েছিলে, তবে হামিদুল তোমায় ঈর্ষা করত কেন ? তোমার নাম তার সামনে মুখে উচ্চারণ করাও যেত না কেন ? তার এত সংকীর্ণতা কেন ? বল ?

আমি আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠি, এ-সব কি বলছ তুমি রাবেয়া ?

রাবেয়ার চোখে জল স্ফুরিত হয়ে টলটল করছে। সে আত্মবিশ্বাসে জোর দিয়ে বলে ওঠে, ঠিকই বলছি আমি।

বললাম, তবু আমরা এক ছিলাম, অন্তত একই বিশ্বাস থেকে আমরা তোমায় ভালোবাসতাম। বিশ্বাস করতাম হামিদুল মামুনকে এবং মামুন হামিদুলকে ভালোবাসে, এই বিশ্বাস আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

—বাজে কথা। এক তোমরা ছিলে না। গায়ের জোরে সত্য প্রমাণ হয় না। তাই যদি হয়, একই বিশ্বাস বুকে নিয়ে আমায় যদি তোমরা ভালেবেসে থাক, তবে আমিও যে তোমায় ভালোবাসি, সে ভালোবাসার মূল্য দিলে না কেন

হামিদুল ? সে তবে তোমায় ঈর্ষা করত কেন ? ঈর্ষাই শুধু নয়। সে তোমায় ভয় করত।

—ভয় ? আমি প্রশ্ন করি।

রাবেয়া বললে, হ্যাঁ ভয়। সে ভয়ের কথা অন্য সময় হবে। কলেজ থেকে এলে, দুটো কিছু মুখে দেবে তো। তোমার মুখটা ভীষণ শুকনো দেখাচ্ছে। চল, ওঠ এবার! হাত-মুখ ধুয়ে নাও। জকে জল রয়েছে।

বললাম, সে না-হয় হলো। কিন্তু সে আমায় ভয় করতে যাবে কেন ? বরং আমিই তো তাকে ভয় করতাম! এঁটো-চুক আম-পেয়ারা হাতে তুলে দিয়ে বলত, ধরে থাক মামুন। খাস নে! আমি তাই ধরে থাকতাম।

রাবেয়া উলের বল কাঁটা একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে এ ঘরের তাকে তুলে রাখতে রাখতে বললে, বরাবরই তার একটা তোমার উপর জোর ছিল। তোমার উপর বলেই নয়, জোর তার নিজস্ব মনের। তার কোনো কাজে কখনো দ্বিধা ছিল না এবং অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাও ছিল না। সেই জোরেই সে আমায় দখল করে নিল। তুমি চিরকাল তার জোরকে প্রশ্রয় দিয়ে গেলে। আজও জোর করেই সে আমায় তোমার ঘরে তুলে দিয়ে গেল, তুমি তাকে প্রশ্রয় দিলে।

—না। সে জোর করে দেয়নি। বিশ্বাস করে দিয়েছে।

—তুমি বল বিশ্বাস আমি বলি জোর, যা দিয়ে সে তার মনের লোভ বাসনা, হীন আকাঙ্ক্ষাকে স্যাটিস্‌ফাই করে। আর এ কারণেই তোমাকে তার জীবনভর প্রয়োজন। বলতে বলতে রাবেয়া ঘর পেরিয়ে ভেতর বারান্দায় চলে গেল। ডাক দিল সেখান থেকে হাতে জক তুলে নিয়ে—নাও এস। পানি ঢেলে দিই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। খেতে বসে বললাম, তবু বলছ সে আমায় ভয় করত! তবে সে জোর করত কোন্ সাহসে ?

রাবেয়া বললে, সাহস নয় মামুন! ভীরুতা, দুর্বলতা। পরাজিত হওয়ার ভয়, হারিয়ে ফেলার ভয়। তাই সে বলত, ধরে থাক মামুন! খাস নে!

আমি চমকে উঠলাম, গলায় খাবার আটকে গেল, আর খুক্ খুক্ কাশি শুরু হলো।

তাড়াতাড়ি রাবেয়া জলের গেলাস সামনে এগিয়ে দিয়ে হাত-পাখার বাতাস দিতে দিতে মাথায় মৃদু মৃদু হাতের তালুর চাপড় দিলে. ফুঁ দিলে টেনে টেনে, যেমন সে ছেলেবেলায় করত। খাওয়া শেষ করে মুখশুদ্ধির মৌরী মুখে ফেলে শখ করে খাওয়া সিগারেট ধরালাম। বিছানায় কাত হয়ে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে টান দিলাম সিগারেটে। রাবেয়া এসে আমার কোলের কাছে বিছানায় বসল।

বললে, তুমি কি জানতে। সে ইচ্ছে করলেই তোমার সাথে আমার বিয়ে দিতে পারত। তার জন্যই আমার কলেজে পড়া হলো না। ভাইকে উদ্বুদ্ধ করে আমার কলেজে পড়া বন্ধ করে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করল। বললে, তুমি আমায় এখন বিয়ে করতে চাও না, কোনোকালে করবেও না, তোমার অ্যাম্বিশন অত্যন্ত হাই! তা ছাড়া তুমি হয়তো মুসলমান মেয়েই বিয়ে করবে না। জানি না, সত্যিই তুমি তা চাইতে কিনা।

হাসতে হাসতে বললাম, সে তো দেখতেই পাচ্ছ, অ্যাদ্দিনও আমি অপেক্ষা করে আছি।

রাবেয়া বলতে লাগল, সে যাই হোক, হামিদুল ভয়ে ভয়ে এই কাজ শুরু করে দিলে। ভাইয়ের মন ভাঙিয়ে দিলে। ভাই দেখল, হামিদুলও তো রাবেয়াকে ভালোবাসে। লোকে জানল, তুমি আমাকে বিট্রে করলে বলে বন্ধু বন্ধুর কাজ করছে। অত বড়লোক হামিদুল, আমরা কত গরিব! এক কানাকড়ি পণ চায় না শিকদারের পো। লোকে জানল, হামিদুল কত-না করুণাপরায়ণ মেয়েদের জন্যে, কত মহৎ এবং বড় মনের মানুষ। ভেতরে ভেতরে তার জোরাজুরির স্বভাবটা তো কেউ টের পেল না। তোমার মেধা, তোমার মস্তিষ্ক তাকে বরাবর ভয় দেখায়, তোমার অন্ধ ভালোবাসা তাকে সাহস জোগায়। এই তো দেখছি মামুন, আমি তোমায় ভালোবাসি এ জিনিস সে একদম সইতে পারে না! অথচ সত্য ভালোবাসার ধর্ম এ নয়।

বললাম, বুঝতে পারছি রাবেয়া, তুমি ওকে সুখী হতে দিচ্ছ না।

রাবেয়া কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমি নই মামুন। তুমিই সব শান্তি নষ্ট করেছ। তোমার জন্যে সে আমায় তালাক দিয়েছে।

এই বিকালবেলায় এই দুর্বিষহ দ্বন্দ্বের আঘাত মস্তিষ্ককে ক্লান্ত করে তুলেছিল। আমি ধীরে ধীরে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, বাইরে মেঘ ডেকে বৃষ্টি শুরু হলো। রাত্রি তখন ঢের হয়েছে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

আমার বুকের উপর মাথা রেখে রাবেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে, এবং এমনভাবে জড়িয়ে অসংবৃত হয়ে শুয়েছে, তাকে ছাড়াতে গেলে, ছাড়ে না। তার শরীরের রক্ত-স্পন্দন এবং সুরভিত ঘ্রাণ একাকার হয়ে আমার দেহে মনে প্রবাহিত হয়েছে।

তাকে জোর করে ছাড়িয়ে উঠে পড়লাম আমি। সুইচ্ অন্ করে দিতেই আলো জ্বলল ঘরে। দেখলাম, উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে রাবেয়া, হাতের মুঠিতে কোচকানো বিছানার চাদর, সমস্ত শরীর ঘামে সিক্ত। ফুলে ফুঁপিয়ে

কাঁদছে।

ডেকে তুললাম তাকে। বললাম, খেতে দাও। রাত হয়েছে!

রাবেয়া উঠে বসে বাচ্চাবেলার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানা থেকে নেমে গেল, তার গায়ের আঁচল মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছিল, লুটিয়ে টেনে নিয়ে চলল সে। চোখ-মুখ ধোয়া-টোয়ার জল-শব্দ শুনলাম। তার পর রাবেয়া ডাকল, এস।

কেমন কড়া গলায় ডেকে উঠল সে।

এ গল্পের পরিণাম আগেই কি লিখে ফেলেছি? বোধ হয় গল্পটা শেষ থেকেই শুরু করেছি। আবার মনে হয়, এ গল্পের শুরু শেষ কিছুই নেই। যেখানে শেষ করি, সেখানেই গল্প সমাপ্ত হয়ে যায়। এর পরই যদি লিখি, তার পর তিন মাস বাদে হামিদুল এসে রাবেয়াকে টাঙ্গায় তুলে নিয়ে গাজীপুর রওনা দিল, তবে কি গল্প শেষ হয় না? হামিদুল এবং রাবেয়া তার পব সুখে শান্তি এবং সাবধানতায় সংসার করতে লাগল, আমিও কলেজ করতে এবং ডক্টরেট লাভের থিসিস লিখতে লাগলাম। কেবল মনে হলো, এই কয় মাস, ৯০টা দিন আমি এক দাম্পত্য জীবনের অনবদ্য বিলাস ও সুখ সমারোহে কাটালাম। মানুষ কি ভাববে, আমি ভুল লিখছি?

মানুষ আমার কাছে যে আচরণ আশা করেছিল, আমি কি তার অন্যথা করেছি? মনের মধ্যে কোনো কোনো মানুষের, যারা ঠিক লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে চেয়েছে, রুচিধর্মের বালাই যাদেব মনের আঙিনা পাহারা দেয়, তাদের মনে গণ্ডি কেটে রাখা রয়েছে, সীতার মতোও তাদের মতিভ্রম হওয়ার জো নেই। রুচি, শিক্ষা, বিবেক, মনুষ্যত্ব, প্রেম-প্রীতি, করুণা, মানবিকতা সবই যেন এক একটি গণ্ডির দাগ। তাকে অতিক্রম করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে রাবেয়াকে স্বামীর সম্পূর্ণ ভোগে অনুরাগে, দাবি দাপটে উত্যক্ত কি কবা যায় না? আমি কি বলতে পারি নে, নিয়তিই সীতার সর্বনাশ করেছে, এই নিয়তিবাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পাবি নি তাই ইন্দ্রতের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। রাবেয়া বা আমার, কারো কোনো দোষ ছিল না!

মানুষ কি বলবে? জগতের কাছে আমার কথাগুলো কেমন শোনাবে? আমি যখন কলেজে গিয়ে ছাত্রদেব হিউম্যানিজম, রজার বেকন, কমিউনিজম, লেনিনের নাম দিয়ে বর্তমান পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতির কথা বলব, যখন আমি শেকসপীয়রের মার্চেন্ট অব ভেনিসের গল্প শুরু করব এবং যখন বলব শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কথা, বড় প্রেম কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে ইত্যাদি, তখন আমার আপন বিবেক রুচিধর্মের কাছে আমার কি কৈফিয়ত থাকবে?

মন কি বলে উঠবে না, বন্ধু তোমায় বিশ্বাস করে তার স্ত্রী এবং স্বপ্ন ভালোবাসা এবং বিশ্বাসকে রক্ষা করতে দিয়ে গেছে, তুমি তার সব কিছুই লুট করলে কেন ?

রাবেয়া অত্যন্ত এলোমেলো হয়ে আমারই বিছানায় এই দুপুর বেলা ঘুমিয়ে রয়েছে। কোনো এক পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মৃত্যুতে এই দুপুরেই কলেজ ছুটি হয়ে গেল। দরজা খোলাই ছিল, নিঃশব্দে ঢুকে পড়েই ঘুমন্ত রাবেয়াকে দেখছি। বর্ষার দিন ফুরিয়ে এসেছে। হিমের ছোঁয়া লেগেছে পৃথিবীর প্রকৃতিতে, সংসারের তাবৎ মহিমায় শরৎ এসেছে আকাশে পেঁজা তুলোর পাহাড় তুলে।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছি, রাবেয়া এমনি এলোমেলো হয়েই শুয়ে থাকছে। আমি ওর মাথার কাছে বসলাম। ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়লাম। ওর উপর ঠোঁটের ভূ-ভাগে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যা অনেক রূপসীদের জমতে দেখেছি, তখন তাকে আরো রূপসী আর কামিনী করে তোলে।

মনে হলো, চুমু খেয়ে ফেলি। অন্যায় হবে না। রাবেয়া বাধা দেবে না। সে যে আজও আমায় ভালোবাসে, আজও সে মনে করে, আমিই তার প্রকৃত প্রেমিক। শুধু কি কলমা-হাদিসের জোরে, ফতোয়া মস্‌লার দাপটে হামিদুলের একান্ত হয়ে সে আমার স্পর্শসুখ থেকে বাইরে দাঁড়াবে ? আমার কাছে, আজ এই ইন্দ্রদেব পুণ্য-ক্রিয়ার তার কোনো যৌন দায় নেই ?

রাবেয়া একটু নড়ে উঠল। কোথায় একটা খুট করে শব্দ হলো। আমি সভয়ে আঁৎকে উঠে মুখ তুলে নিলাম। নিজেই আশ্চর্য হলাম, আমার কত ভয় ! চোখের সামনে মনের কিনারে ভেসে উঠল ছেলেবেলার হামিদুল। ধরে রাখ মামুন ! খাস নে !

দেখলাম, স্বাস্থ্যময়ী নিদ্রাবতী রাবেয়ার কাপড় আলগা হয়ে খসে পড়া কোমর, তলপেট, বুকের চূড়া থেকেও কাপড় সরে গেছে, রাবেয়া জামার ভিতরে অন্য কোনো আবরণ দেয়নি।

এও কি ঠিক হচ্ছে ? নিজেও কেমন চমকে উঠে দাঁড়ালাম। রাবেয়া আবার নড়ে উঠে চিত থেকে কাত হয়ে গেল।

আমি ঘর ছেড়ে ভিতর বারান্দায় চলে এলাম। জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা পানি খেলাম এবং ইজিচেয়ারে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ছড়িয়ে বসে সিগারেট ধরালাম। সিগারেট খেলে ইদানীং মাথাটা সাফ হচ্ছে বলে মনে হয়। বুঝলাম, নেশায় ধরেছে। আস্তে আস্তে গা এলিয়ে শুয়ে গেলাম চোখ বুজে।

সময় অতিবাহিত হতে থাকল। এবং ক্রমশ নিজেকে সমস্ত ঘটনা পূর্বাপর ভেবে নিয়ে মনে হলো, আমি একটা ব্যক্তিত্বহীন নির্জীব প্রাণী। হামিদুলের কাছে আমার দেনাদায়ের অন্ত নেই, ঋণের পর ঋণ করে গেছি, কখনো সে শোধ নেয় নি, হাতে যা তুলে দিয়েছে, তাকে বলেছে দান, বলেছে এ দেওয়া বন্ধুর কর্তব্য, কখনো সে ফেরত নেয় নি, কখনো সে তার এই দেওয়া-থেওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমায় পীড়া দেয়নি।

আজ তিন মাস হতে চলল, হামিদুল তিনখানা চিঠি লিখেছে কেবল। এম ও করে মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছে রাবেয়ার নামে, আমার প্রযত্নে। টাকাগুলো খরচ না করে বাক্সে ফেলে রেখেছি। সাদামাটা ফর্মাল চিঠি, টাকা পাঠালাম, দরকার মতো খরচ করবে, আরো যদি প্রয়োজন মনে করো লিখবে, আমি ভালো নেই, তোমরা কেমন আছ লিখে জানাবে। চিঠি এসেছে, সে-চিঠি খুলেও দেখেনি রাবেয়া, টাকা স্পর্শ করেনি। বলেছে, এই তিন মাসের ভরণ-পোষণ তোমার, আমি অন্যের টাকা ছোঁব কেন?

আমি বলেছি, এ টাকায় কী করবে না করবে, আমি কিছুই বলতে পারি নে, তোমার নামে পাঠানো টাকা, রেখে দিলাম, প্রয়োজন মনে করলে ফেলেও দিতে পার, এই নাও বাক্সের চাবি।

চাবিটা খাটের উপর ফেলে দিয়ে কলেজ চলে গেছি, ফিরে এসে দেখেছি, চাবিটা তাকে তোলা রয়েছে, চাবি দিয়ে বাক্স খোলা হয়নি। টাকা যেমন ছিল, তেমনিই পড়ে আছে।

এই তিন মাসে হয়তো বড় জোর তিনদিন রাবেয়া আমার মানিব্যাগ খুলে কাছের দৈহাট্টার বাজারে সংসারের টুকিটাকি সামান-আসবাব, ছোটখাটো তেল-তোয়ালের মতো নিত্যদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র কিনে এনেছে। মন্টি নামে একটি অ্যাংলো রিকশা চালককে বলে রেখেছি, মিসেসকে তার ইচ্ছে মতো শহরটায় ঘুরিয়ে আনবে, কোথাও বেড়াতে যেতে চাইলে, সিনেমায় গেলে, নিয়ে যাবে, রাবেয়া কিন্তু দৈহাট্টার বাজার ছাড়া কোথাও কিছু দেখল না।

একদিন কথায় কথায় বললাম, কোথাও গেলে তো পার! সারাদিন একলা থাকা!

ফুলমতি সকালের রান্না করে রেখে চলে যায়। হাটবারে হাটে যায় আপন হাতে ফলানো সবজি নিয়ে বকুলতলার হাটে, সেদিন আর বিকালে আসে না। বিকালের রান্না পুরোটাই রাবেয়াকে করতে হয়। কিন্তু দুপুরটা ভীষণ নির্জন

নিঃসঙ্গ, ঘুমিয়ে কাটানো কিংবা বইপড়া আর উলের বল কাটা, এতে মনটা তো খাঁ খাঁ করবেই।

রাবেয়া বলেছে, তিন মাস তোমার এই ঘরে হাজত-বাস করছি, ছুট কয়েদির মতো কোথায় পালাব ? বিনে সুতোয় তিন কথায় যতটুকু বাঁধবার বেঁধেছ, ফের যেদিন তালাক দিয়ে ফিরিয়ে দেবে, এই সুন্দর খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাব আর এক পিঞ্জিরায়, মেয়েদের কোথাও মুক্তি নেই !

বলেছি, মনেরও কিছু আলো বাতাস চাই, রাবেয়া। এখানে একটা চমৎকার কবিতার মতো নদী আছে। দেখেছ ?

রাবেয়া খুশি হযে বলেছে, দেখিনি। আভাস পেয়েছি। এই জানলাটায় চোখ রাখলে একটা ঝলক আসে, গন্ধ পাই। চিতি। সত্যিই বড্ড মিঠে নাম নদীটার।

—ইয়েস ! ভেরি সুইট ! যাবে ?

—গাঁয়ের মেয়ে আমি, নদী কি দেখি নি ? রাবেয়া কথা বলে।

—দেখেছ বলেই তো গন্ধ পাও, ঝলক পাও। চোখ জুড়াবে তোমার। একঘেয়েমিও কাটবে। কোথাও গেলে না, চল, এট্টু নদী দেখে আসি !'

সেদিন রাবেয়া রোজকাব মতো জানলার আধ-খোলা কপাট পুরো খুলে উদাস হয়ে চিতির পলিজল মেশানো তটভূমির দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে বললে, যাব ! তার পর পেছনে ফিরে বললে, শহরে শুনেছি, অনেক মেলা-খেলা হয় ! কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও কোনো উৎসাহ পাই না। তোমার কি মনে হয়, আমরা দুজন আত্মগোপন করে আছি ? তুমি তো সব সময় চোরের মতো থাক। একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে।

—কী কথা ?

রাবেয়া মুচকি হেসে জানলা ছেড়ে সরে আসে। বলে, তুমি রাগ করবে না ?

বললাম, রাগ কেন করব ? রাগের কথা বললে নিশ্চয় করব।

—এই তো ! আগেই তুমি রেগে উঠেছ ! তবে থাক। আরো দু দিন ভাবতে দাও।

বললাম, মিছেই কেন দুঃখ পাচ্ছ ! আগে বলই না শুনি ?

রাবেয়া বললে, আগে কথা দাও। তুমি রাগ করবে না ? রাগের কথা হলেও রাগবে না। গা ছুঁয়ে বল !

—বেশ তো ! কথা দিলাম। এবাব বল।

রাবেয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, সত্যি করে বল, তোমার এই জীবন ভালো লাগছে ?

—কোন্ জীবন ?

—এই যে তোমার আমার জীবন। এই ঝুট দাম্পত্য। মিছিমিছি বানানো ছায়াবাজি।

বললাম, বুঝেছি। তোমার খুব মনস্তাপ হচ্ছে। কষ্ট পাচ্ছ।

রাবেয়া বলে, কষ্ট নয়। ভাবছি, আমরা দুজন কোনো মুখোশ পরে নেই তো ?

বলেই আমার একখানা হাত চট্ করে চেপে ধরে রাবেয়া। বাগ কোরো না লক্ষ্মী ! আমাব ভুলও হতে পাবে !

দেখলাম, রাবেয়া যা বলতে চেযে এগিয়েছিল, তা চেপে যাচ্ছে।

বললাম, ভুল কেন হবে। ঠিক কথাই বলেছ পিয়ারী। মুখোশ। একটি মুখোশ স্বামীর। একটি স্ত্রীর। মুখোশ তিন মাস বাদে খুলে ফেললেই আমি মামুন রহমান, অধ্যাপক। তুমি হামিদুল-পত্নী গাজীপুরী, শিকদারের বউমা। ছায়াবাজিই বটে !

হা হা করে কখন নিজের মনের অজান্তে হেসে উঠি। রাবেয়া অসহায়ের মতো কেঁদে ফেলে। বলে, তোমাকে জেনেশুনে কষ্ট দিচ্ছি মামুন ! আর কখনো এমন করে বলব না। এস আমরা আমাদের সামনের এই কয়টা দুর্লভ দিনরাত্রি যেমন করে পারি সুখে সুষমায় ভরিয়ে তুলি। আমি যাব, নিশ্চয়ই বেড়াতে যাব। চিতির খেয়াঘাটে নৌকা চড়ব। নদীর ওপারে ফুলমতির বাড়ি। সেখানে গিয়ে একটা মেয়েলি ভাবের আসর বসবে।

বললাম, মেয়েদের ভাবের আসর। সে এক বিষম বস্তু। ওতে আমার ভারি লোভ।

রাবেয়া বললে, লোভ যতই থাক। ফুলমতি আর আমার দোস্তালিতে তুমি পুরুষমানুষ, ঢুকবে কেন ? তোমায় আমরা নেব না।

বললাম, না নাও, আমি তখন চিতির সাথে ভাব করব। একলা একলা ঘুরব। মেয়েদের হেঁসেল-ঘরেব কাব্য যতটা ভাবছ, আমার ওতে ততটা রুচি নেই। আটক কাজে যাও তুমি, লাউ কুটতে বসি আমি। ওরকম খুনসুটির কষাটে রসে ভিয়ান দেয়া মেয়েরাই পারে। বলতেই আমার সাথে রাবেয়াও হেসে উঠে বলে, তুমি অনেক তথ্যই জান দেখছি। কিন্তু এটা তো জান না, মেয়েরা সংসার-জীবনে পড়শি না পেলে হাঁপিয়ে ওঠে।

বললাম, হাঁপিয়ে ওঠে বলছ কি, একদম টেঁসে যায় বল। সেইজন্যে বলছি, মনে একটু আলোবাতাস দাও। চল, বেরিয়ে পড়ি।

—এখনই যাবে নাকি ?

—কাল রোববার। কাল যাব। বেলাবেলি গিয়ে ফিরে আসব। কথাটা

ফুলমতিকে আগে জানিয়ে রাখলে ভালো হতো।

রাবেয়া বললে, তার কোনো দরকার করবে না। আমরা তো নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না। হাওয়া খেতে খেতে উঠব গিয়ে। বাঘাই-এর দুধে পায়েস রাঁধবে ফুলমতি। সরষের তেলে পরোটা। আর এক গেলাস দুধেল চা। কিন্তু এই বেলা গুঁড়ো দুধে চা দেব এখন। বিরক্ত হলে পারব না।

—গুঁড়ো দুধ কেন?

—সে এক চিত্তির হয়েছে। বাঘাইয়ের দুধ লেলকি বাছুরে নিংড়ে চুষে খেয়ে ফেলেছে। ফুলমতি দুধ দেয়নি। বলতে বলতে রাবেয়া রান্নাঘরের দিকে চলে গেছিল সেদিন। ফিরে এলে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলেছিলাম—যাই বলো রাবি! মুখোশ পরেই থাকি আর আত্মগোপন করে ভয়ে-ডরেই থাকি, আমি আমার বিবেকটা সাফ রাখতে পারলেই খুশি।

রাবেয়া চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, তুমি ফের আবোলতাবোল ভাবতে শুরু করলে! এইজন্যেই আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলতে পারি না। আজ মনটা এত ভালো ছিল, ভেবেছিলাম, তোমাকে একটা সুন্দর স্বপ্নের কথা শোনাব, তা আর হলো না।

—স্বপ্নের কথা? বেশ তো! শোনাও না!

—এখন তুমি বিরক্ত হবে। বাস্তবে মানুষ যা পায় না, স্বপ্নে তা খুঁজে বেড়ায়।

বললাম, সচ্ বাত্। ষোলআনা সত্যি। আমি কী ভেবেছি জানো! দুঃখে-কষ্টে পড়ে মানুষ কবি কিংবা দার্শনিক হয়ে যায়, এটাও কিন্তু সচ্ বাত্। আজকাল সস্তা কাব্য করার বাতিক হয়েছে আমার। স্বপ্নের কথা বললে তো! সেদিন ভাবছিলাম, এই তিন মাস কোনো বাস্তব বিষয় নয়। স্রেফ একটা স্বপ্ন। ভাবতে বেশ। কিন্তু আসলে এর চেয়ে রূঢ় বাঁকা কুটিল বাস্তব ব্যাপার আর কিছু নেই। এর স্মৃতি, এর সোয়াদ, এর তৃষ্ণা, অতৃপ্তি মানুষকে ফৌৎ করে। চোরাগোপ্তা একটা স্রোত তলে তলে নাড়া দেয়, ইমোশানে ঘাই মারে। পাকে পাকে জড়িয়ে দেয়। যেহেতু মানুষ আফটার অল মানুষই। মেশিন নয়। তাই এই তিন মাসে মানুষকে বিস্তর স্বপ্ন দেখতে হয়।...তোমার স্বপ্নটা কি শুনি?

রাবেয়া গম্ভীর হয়ে বললে, তুমি মাঝে মাঝে এমনভাবে কথা বল, মনে হয়, অন্যের মনের শেষ কিনারায় তোমার দৃষ্টি পৌঁছে গেছে। সেখানে এইমাত্র যে আবেগের ছোট্ট বুদবুদটা উঠে ফেটে গেল, সেটুকুও তোমার নজর এড়ায় নি।...যাই হোক। স্বপ্ন দেখলাম। একটা মেলায় গেছি আমি। বিনোদপুরে পৌষ মাসে প্রতি শনি-মঙ্গল মেলা বসত, মনে পড়ে? সেই রকম মেলা। মনের

মধ্যে একটা নাগরদোলা ঘুরছে আমার। মেলার সেই নাগরদোলায় বাচ্চারা সব চড়েছে। দোলা ঘুরছে। আমি ওদের খোপে খোপে সাজিয়ে তুলে দিচ্ছি। নামিয়ে নিচ্ছি। আমার কোনো ক্লান্তি নেই। কোনো বিরাম নেই। এ স্বপ্নের কোনো মানে হয় ? এই দোলার মধ্যে আমার মুন্না কোথাও লুকিয়ে আছে।

—মুন্না ? তোমার মুন্না ?

—হ্যাঁ গো। আমার খোকা। আমাদের ছেলে।

—কোথায় সে ? কখনো বলনি তো!

—বলব কি ! ও তো স্বপ্নের মধ্যেই রয়েছে। স্বপ্নটা মিষ্টি, কি মিষ্টি ! তাই না ? কিন্তু সে একদিন বাস্তবেও ছিল।

—ছিল ?

—রক্তেমাংসে ছিল। এখন স্বপ্ন ছাড়া কোত্থাও তাকে পাওয়া যায় না

একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমারও। বললাম, স্বপ্ন আর বাস্তবটা এত মাখামাখি আগে জানা ছিল না। দাও, আর একটু চা দাও !...

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। চিতির খেয়াঘাটে পৌঁছতে সময় বেশি লাগে নি। একটু একটু শীতালি হাওয়া দিচ্ছে প্রকৃতি। রাবেয়া তার মনের মতো কবে সেজেছে। আমার পছন্দ করা সন্ধ্যামণি ফুলেব মতো স্নিগ্ধ বঙের শাড়ি, কালচে লাল ব্লাউস। অপ্সরা খোঁপায় রাবেয়াকে অচেনা নারীর মতো আপন সৌন্দর্যে কুণ্ঠিত মনে হচ্ছে। এমন-এক অচেনা বিস্ময় কোথা থেকে আসে, এই দুই চোখ তার ব্যাখ্যা পায় না। এই অচেনাকে স্পর্শ করলে স্পর্শভার সে উপেক্ষা করে না, এর চেয়ে ভালোলাগা অনুভূতি আর কী আছে ? হাতের সোনালী চিকণ চুড়ি একবার ছুঁয়ে দেখি। যেন ঠিক শিশিরের সৌন্দর্যকে স্পর্শ করছি এইভাবে কেঁপে ওঠে রাবেয়া। শিহরিত হয়। মনে মনে বলি, তুমি ঠিক হুরীর মতো অলৌকিক রাবেয়া ! ছুঁয়ে ছেনে দেখতে বড় সাধ হয় !

হঠাৎ কবিত্ব করে রাবেয়া বলে, নদী ছাড়া তোমার কি কোনো বন্ধু ছিল না ?

চমৎকার প্রশ্ন। বললাম, এ শহরে আমি একজন কোরা বাসাড়ে। আধুনিক নাগরিক কবির মতো একলা। আমার জীবনে গীতি-কাব্যের নির্জনতা বিষণ্ণতা, এক ধরনের ব্যথিত বিষাদ আছে। মানে বোঝ ?

রাবেয়া বললে, প্রত্যেক অতৃপ্ত প্রেমে ব্যথিত বিষাদ অবধারিত প্রসঙ্গ—এই বুঝি ! এত স্বচ্ছন্দে এত সুন্দর কথা বলতে পারে রাবেয়া, ভেবে অবাক হই। নদীর এপারে কিনারে ঝুঁকে থাকা বিশাল বট-পাকুড়ে জড়াজড়ি গাছের শিকড়ে বসি দুজন। দুপুরের নির্জন ঘাট। মাঝি নেই। ওপারে নৌকো বাঁধা। পেছনেও

ফসল কেটে নেওয়া ফাঁকা মাঠের শূন্যতায় দু-চারটে বিরল বাবলা তাল খেজুরের নির্জনতা। দু-চারটে উন্মনা গোরু চরছে। পেছনে তাকালে চোখে পড়ে ইলেকট্রিক তার আর তার শাল কাঠের খুঁটির দূরত্ব, পাকা সড়কে ছুটন্ত শহরমুখো লরি। রাবেয়ার দিকে চেয়ে দেখি, মুখে ক্লান্ত ঘামের ফোঁটা। পায়ে ধুলো-মাখা চটি। নদীর স্রোতের দিকে চেয়ে আছে যেন এক বিষণ্ণ প্রতিমা। মানুষ ভাবতে পারে, এই রকমই তুচ্ছ কাব্যের লোভে আমি তাকে চিতির কূলে কাঙালের মতো টেনে এনেছি। কবুল করব আমি লোভী। এর জন্য মানুষ সংসারের তিরস্কার সইতে দুঃখ পায় না। এ মুহূর্তে আমি সুখী। এ সুখের অবধি নেই।

ওপারের নৌকোর দিকে চেয়ে বললাম, মাঝি নৌকো বেঁধে বাড়ি গেছে। স্নান-খাওয়া করে তামাক টেনে জিরোবে, তারপর ফিরবে।

রাবেয়া ব্যথিত বিষাদে তন্ময় হয়ে হয়তো কোনো অকূলে নিজেকে হারিয়ে বসেছিল, চমকে উঠে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললে, তাই বুঝি?

বললাম, তালেব মিঞার নাও, বুঝলে! ধান পাটের মরশুমে ধান পাট, গমের মরশুমে গম মসুরী, সরষে তিসির পাঁজা দেয় লোকে। চাকুরে যারা, বৎসরান্তে দশ পনেরো বিশ পাঁজা বাবদ মেটায়।

রাবেযার তন্ময়তার ঘোর এখনো যায়নি। আপন মনে বললে, তাই বুঝি!

বললাম, ঐ যে কুঁড়েঘর দেখছ, ওটাই হচ্ছে ডেরা। এখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেও শুনতে পাবে না। শুনতে পেলেও সাড়া দেয় না। তামাক টানার সময় বেটা মাঝি কানে তুলো দেয়। কোনো তোয়াক্কা রাখে না।

রাবেয়া ফের বলে, তাই?

বললাম, তা ছাড়া কী!

—তবে তো বেশ লোক। সব খেয়াঘাটই কি এ রকম? সব মাঝিই কি সমান? সব নদীই মনে হয় চেনা। এতে যারা পারে যায়, তারাও কি সব এক? ঐ দেখ দু জন এসেছে।

পেছনে চেয়ে দেখলাম, একজন পাকা প্রৌঢ় আর একটি নব্য যুবতী এসে বট পাকুড়ের শেকড়ে ঠেক নিল।

লোকটির কানে আধ-খাওয়া পোড়া বিড়ি। মুখে প্রাচীন বসন্তের দাগ। ফুট্‌কি ফুট্‌কি নকশা। মাথার চুলে দাড়িতে গোঁফে রুপোব ঝিলিক। তোবড়ানো গালে প্রৌঢ়ত্বের ভাঙা নিরাশা। চোখে কঠিন ক্রূর দৃষ্টিতে কেমন বিহ্বলতা। পরনে তার সস্তা নতুন কেনা ঝিলমিলানো নকশাদার লুঙ্গি, গা-পিছলানো রঙ। গায়ে পুরনো সাদা জ্যাকেট, কাঁধের কাছে পট্টি মারা। পায়ে টায়ারের ছেঁড়া মাখন-চটি।

লোকটি বিড়ির কৌটো থেকে নিজে হাতে বাঁধা কাঁচা বিড়ি বার করে লাইটারের চাকতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সলতে মুছে ধরিয়ে নেয়, চোখে পিচুটির সাথে বিষণ্ন ক্ষুধার্ত জল চিকচিক করছে।

রাবেয়া বললে, দেখতে কার মতো বল তো ? সরদীঘার শাদা মিঞার মতো, হুবহু এক দেখতে। আমি প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। শাদা মিঞা এখানে কেন আর শাদা মিঞা ভাববে আমি এখানে কেন। খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছি। দেখ না ভালো করে, আদলে ছবিতে সেই একই লোক।

আমাদের থেকে বিশ-পঁচিশ বিঘৎ দূরত্বে ওরা বসেছিল। আমাদের কথা হয়তো ওরা একটু শুনতেও পাচ্ছিল। লোকটি বিড়ি টানছিল আর আমাদের দিকে বার বার চেনা মানুষের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছিল। লোকটির দু বার বিড়ি নিভে গেল, দু বারই ধরিয়ে নিল।

পা ছড়িয়ে বসেছে মাথায় ঘোমটা টানা কাঁচা যুবতী। কোলে ন্যাকড়ায় জড়ানো মাংসপিণ্ড। বুকের মায় কালো ব্লাউজ থেকে আল্‌গা করে সবজী পাড় শাড়ির আঁচলে বাচ্চার মাথা-গা ঢেকে দুধ দিচ্ছে। বাচ্চা চিন্‌চিন্ করে কাঁদে। কান্নার সুরে কী দুর্বোধ্য অভিযোগের ধারালো চিৎকার। আমরা কিছু কৃপণ সুখের তল্লাশে তিন মাসের অপুষ্ট স্বপ্নের হাত ধরে চিতিব দিগন্তে এসেছি, এখানেও কান্নার নিষ্ঠুরতা।

ভালোবাসার চকিত রহস্যকে খুঁজে দেখার আকুলতা মনে যে তাগিদ দিচ্ছিল, এখন তা কান্নার দাপটে খানিক বোকা হয়ে গেছে।

বললাম, ওদের সাথে একটু কথা বলি ? সেই সব গ্রাম-ঘরের চাচা ফুপাব গুষ্টি, বেদের বাঁশ-নলার মতো সম্পর্ক ধরে এগোলে গেঁথে ফেলতে কতক্ষণ ! গাঁয়ের মানুষ গায়ে পড়ে ঢলানি করে, শহুরে শিক্ষিতরা বলে, এরা হচ্ছে ভাব-বেশ্যা, এ অপবাদ একদম মিছে নয়। কিন্তু এর যে কী আঠালো রস, শহর তার হদিস পায় না। সম্পর্কের বিশুদ্ধ প্রণয়ে গাঁয়ের কোনা বিশেষ ভক্তি নেই। সম্পর্ক একটা পেলেই হয়, ব্যস থিতু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে আলাপে আলাপে বেলা বাড়ে, ফোঁটায় ফোঁটায় রসে কোনো খামতি হয় না। কিন্তু শহরে এ রকম গা আল্‌গা দেয়ার সময় কোথায়, ঘাসের আস্তরণের তলায় তলায় ট্রামের লাইন পাতা, কখন যে পেছনে এসে ট্রাম ঘণ্টি বাজায়, গাঁয়ের চাষা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বোকা হয়ে ভাবে, এই হচ্ছে শহর ! সতর্ক না থাকলেই টেঁসে যাবে তুমি !

রাবেয়া বললে, বাঃ, চমৎকার বলেছ ! শহরে এলে বোঝা যায়, মানুষের জীবনটা কতটা সূক্ষ্ম সুতোর উপর ঝুলছে। শহর বলতে অবিশ্যি কলকাতা।

তোমার এ শহর গাঁয়ের জমিদারের মতো ঢেকুর হাই তুলে চলে, পায়ে কাদা মেখে জংলায় নামে। বিশাল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এ শহর আপ্রাণ শহর হতে চাইছে, সাধ্য তার সামান্যই। থাক ওসব বাজে কথা। ওদের একটু গাঁথো দেখি। কোথায় যাবে ওরা ?

শুধালাম, তোমরা চললে কোথায় চাচা ? এলে কোথা থেকে ?

চাচা বলে ডাকতেই চাচার মনের ভেতর নাড়া খেয়ে গেল। বিড়িতে সুখটান মেরে বোঁটা ফেলে দিল ছুঁড়ে। তারপর গড়গড় করে বলে যেতে থাকল, আলাম আপনার তেঁৎলে থেগে, যাচ্ছি তক্তিপুর। মেইছেলিডারে লিয়ে যাচ্ছি সোয়ামীর বাড়ি। সোয়ামী আজ আট মাস লয় মাস খোঁজ লিলে না। বাচ্চা হলো, তবো আসে না।

প্রৌঢ় দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিরিক করে থুতু ফেলে বললে, হাওয়া মুরগের পানা পুরুষ-চাষার মন, মছলমানের গেরস্তালীতে হামেশা যা হচ্ছে বাবাজীবন ! কেউ তালাক দিয়ে লেয় না, কেউবা তালাকও দেয় না, ভাত দিবারও নাম লেয় না, বোঝেন বাবা ! এ কেমুনধারা ছাস্তি একবার জরিপ লেন দেহি ! রাবেয়ার দিকে চেয়ে দেখলাম, চোখমুখের সজীব মাধুরী কোন এক অদৃশ্য ধূমল অন্ধকার চুষে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে। চোখের সামনে দেখা এ দৃশ্যের একটা নিদারুণ প্রতিক্রিয়া আছে।

প্রৌঢ় তখনও বলে চলেছে, তক্তিপুরের মোড়ল শাবান মিঞা এট্টু ভরসা দিয়েছে আমারে, দেখি যাই ! যতি মেইডার এট্টু হাত-পা ধরে গতি করতে পারি ! বললাম, বাচ্চার টানে যদি নেয়, নিতে পারে। মেয়ের স্বামী কি ফের নিকে করেছে ?

প্রৌঢ় বললে, সেই রকমডাই শুনছি বাপধন।

বাচ্চাটি তীক্ষ্ণ রেয়াজে ফের বেজে উঠল। ওপারে নৌকয় মাঝি এসে গেছে দেখা যায়। লোকটি এবার উঠে দাঁড়ায়। বউটিও খাড়া হয়। বাচ্চাকে ঘাড়ে পাট করে বুকের সাথে চেপে ধরে নৌকোর দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে সামনে পা বাড়ায়। রাবেয়া কখন দ্রুত এগিয়ে গেছে বউটির পেছনে।

আমার পেছনে আধ-বুড়া বিপর্যস্ত লোকটি। দেখলাম খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটছে। বললে, শেষ জুয়ারের পানি, তারই ফসল এই মেয়ে, বাবাজী ! দামাদ যেতি না লেয়, কুন গাঙে ভাসাব এই মুখপুড়িকে, ভাবেন তো মিঞা !

—কী করেন আপনি ? জমি জায়গা কিছু ?

—কিচ্ছু নাই বাবা। শুদ্দু এই জ্বালা-পুড়া করা গতর। এই হচ্ছে সিমিস্যা, চলে না বাপ ! লিজে খাব, না, তারে খাওয়াব, কহেন বাবাজীবন ! এ গতরে আর

ঘামও নাই, লোহুও নাই। বেচব কী ? চোখের জ্যোতি, সে-ও কেউ কিনবে না। রাবেয়া এই কথা শুনে পেছন ফিরে চকিতে তাকাল। মুখে এক ঘোর তমসা ছেয়ে আছে, ঠোঁট দুটি তার শুকিয়ে খরখর করছে।

ফের শুধালাম, জামাই কি করে ?

বললে, ঝাঁকা-অলা, মুরগীর ব্যাপারী। ধূর্ত্ত। কথায় কথায় কছম খায়। দামাদের মুখে নুড়ো দিতে হয় বাপ। কছম করে মজলিসে সেদিন কইলে মেয়ে লিবে, আবার কছম খেয়ে কইছে মেয়ে লিবে না। মানুষের কিরা-কছমের কী দাম, কহেন্‌ তো বাপধন !

নৌকোয় চেপে বউটির দিকে বার বার দৃষ্টি ছুটে যেতে লাগল। রাবেয়া ওর খুব পাশে বসে ওরই ঘোমটার আড়ালে থাকা লাজ-লজ্জার মিঠে ভীরুতা আর অসহায় সারল্যের মুখখানি চেয়ে চেয়ে দেখছিল, চাপা সুরে কি সব কথা চোখের ইশারায় বিনিময় হচ্ছিল জানি নে। দেখছিলাম, পায়ে আলতাব পোঁচে গার্হস্থ্যের নিশানা, দাম্পত্যের আহ্লাদ। ভাবছিলাম, ধূলায় মলিন পা দুখানি হয়তো পথেই হারিয়ে যাবে। কোথাও পৌঁছবে না।

আরো দেখছিলাম, মনের চিন্তার চাপে চেহারা কি দ্রুত পবিবর্তিত হয়ে যায়। অচেনা হয়ে ওঠা রোমান্টিক মেয়েটি দেখতে দেখতে কোথায় হারিয়ে গেল। তার হৃদয়ের গোপন স্পন্দন এখন আর ধরতে পারছি না। এতক্ষণে সে সত্যিকার অচেনা হয়ে উঠেছে। একটা সামান্য দৃশ্যে মনের তাবৎ পরিস্থিতি ভূ-কম্পনের মতো ওলটপালট হতে পারে, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক বিপর্যয়ের নিয়ম কখনো কখনো চৈতন্যের পৃথিবীতে চোখেও দেখা যায়।

আমার খুব ভয় করতে লাগল।

বউটি ন্যাকড়া দিয়ে বাচ্চাকে ভালো মতো জড়িয়ে নিচ্ছে, নৌকো ভিড়ছে চিতির অন্য কূলে। তালেব মিঞা নয়, তালেব মিঞার ছেলে ইদ্রিশ নৌকো বাইছে। আকাশে পান-চুনের মতো সাদা মেঘ। আকাশের রঙ মটরশুটির ফুলের মতো নীল। আশ্বিনের বিকাল এসে গেল। রোদের উত্তাপে স্নিগ্ধ আমেজ, হিমের ওম। চোখে বাতাসের মৃদু ধারালো স্পর্শে জল ভাঙে দুঃখিত মানুষের। মানুষের দুঃখ বেড়ে ওঠে।

নৌকো থেকে নেমে বউটি আর লোকটি অন্য দিকে চলে গেল। আমরা পশ্চিমমুখো হাঁটতে লাগলাম। পলিমাটির থলথলে চোরা বিপজ্জনক মাটির কিনারা। বিধ্বস্ত খাড়ি। অনাবাদী ঘেসো জমিতে গোরু ছাগল মোষের দঙ্গল।

পশ্চিমে এক বাঁশ উঁচুতে সূর্য দীপ্যমান। রাবেয়ার চোখে গাঢ় জল আর সূর্যের কিরণে ঝিলিমিলি। খুব পশ্চিমের দিগন্তে গাঢ় কালো মেঘের মাথা তুলে ওঠা ছোট্ট পাহাড়। ঠেলে ঠেলে উঠছে। সাদা মেঘের হালকা ডিঙার পাশে আলকাতরার মতো কালো পালতোলা একটি ডিঙির ভয়াবহ প্রস্তুতি। একটি মোষ ঘাস ছিঁড়ে খেতে খেতে হঠাৎ পশ্চিমের মেঘের দিকে চেয়ে রইল, তার পর পা ঝামড়ে ফোঁৎ করে উঠল।

রাবেয়া এখন আমার গা ঘেঁষে হাঁটছে। মোষটির রকম দেখে আমার বাঁ হাতখানা সজোরে চেপে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে। মোষটির বুকের ভিতর একটা অচেনা ভয় পাক দিয়ে গোঁত্তা মেরে উঠল। কালো মেঘ। ওটা কি? আরো দু-বার ফোঁৎ করে উঠে সামনের দু পা সামনে শূন্যে তুলে লেজ নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে উন্মাদের মতো দিকভ্রান্তির নেশায় পালাতে শুরু করল গোঁ গোঁ আর্তনাদ ছড়িয়ে। পেছনে রাখাল ছুটেছে।

মানুষও এ রকম ভয় পায়, বুকে ত্রাস লাগে। সব কিছু শূন্যে ঘুরতে থাকে।

রাবেয়া বললে, আমরা এভাবে বেড়াতে বেরিয়ে ভালো করিনি মামুন! চলো ফিরে যাই!

—ফিরে যাব? কেন? ভয় পেয়েছ?

—পেয়েছি বৈকি! কথা না বাড়িয়ে আমি বলছি, তুমি ফিরে চলো।

—আর একটু গেলেই ফুলমতির বাড়ি। ওখানে গিয়ে সন্ধ্যার চাঁদ উঠত আকাশে, আমরা তখন ফিরে আসতাম।

—না!

—কি না! তোমার হয়েছে কি বলবে তো!

রাবেয়া আমার দিকে কঠিন চোখে চেয়ে দৃষ্টির শাসন হেনে বললে, জানতে চেও না, আমি কেন ফিরতে চাই। বললেও তুমি বুঝবে না। মানুষের মন একটুও যদি বুঝতে, নিজে থেকেই এতক্ষণ ফিরে যেতে চাইতে।

—বেশ, ফিরেই যাচ্ছি। কিন্তু তুমি অকারণ দুঃখ পেয়েছ। বউটা দেখতে যেমন মিষ্টি, তেমনি করুণ।

—মর্মান্তিক। পুড়ে যাওয়া সাদা রুমালের একাংশ। পৃথিবীতে কোথাও সুন্দর কিছু নেই। ওদের চেয়ে দেখে আমার কি হয়েছে বোঝাতে পারব না। তুমি একটা ভুল পথে আমাকে ফুসলে এনেছ। আমি আসতে চাইনি।

—ফুসলে এনেছি? আসতে চাও নি?

—না। একদম না। এটা চোরা পথ। এটা কোনো পথই নয়। এ নদী অভিশপ্ত।

—নদীর ওপর রাগ করছ কেন ?

—চিতি একটি সাপের নাম। এটা কোনো কবিতা নয়, আমি ভুল বলেছি।

—বেশ, বেশ। তাই সই। কিন্তু সব ঘটনাকে একটু অন্যরকম করে ভাবলে ভয়ের কিছুই ছিল না। রোজকার একটা সাধারণ ঘটনা...

—ক-দিন আগে এই নদীর দকিজলে (পলিজলে) একটি নধর গাই পুঁতে মরেছে, গাইটার দকি-সমাধি হয়েছে। ফুলমতি বলেছে আমাকে।

—এ কথা আগে বলনি কেন ? দকি থাকলেই সমাধি হতে পারে। সব নদী সমান। তুমিই বলেছ।

—বলেছি বেশ করেছি। তুমি বেছে বেছে সেই নদীতে কেন এনেছ, জানি না ?

—কেন এনেছি ?

—এখানে এভাবে বেড়াতে তোমার ভয় করছে না ? বুকে হাত দিয়ে বল ! একটু আগেই ঐ বুড়োটাকে আর বউটিকে আমাদের খুব চেনা মনে হয়েছিল। হয় নি ?

—হয়েছিল। কিন্তু ওরা কেন, কেউ আমাদের এখানে চেনে না।

—ইয়েস, চেনে না। চিনলে কী করতে ? চেনা হলে নিশ্চয় তুমি আসতে না ? কেন আসবে, আমাকে নিয়ে সব সময় তুমি কাঁপছ, লজ্জা পাচ্ছ। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার কারণে তুমি ছোট হবে, আমি তা চাই নে মামুন ! লোকচক্ষে, কেন তুমি বিড়ম্বিত হবে ! সত্যি তো তোমার কোনো দোষ নেই। এইজন্যে কোথাও কখনো কোনোদিন বাইরে যাওয়ার আবদার করিনি। আমি এক্ষুনি ফিরব। একদণ্ডও আর নয়। বলেই রাবেয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে খেয়াঘাটের দিকে ছুটে চলল। আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম পিছু হাঁটতে হাঁটতে, দেখ রাবেয়া ! তুমি মস্ত ভুল করছ। নদীকে ঘিরে আমার ইমোশন তুমি বুঝতে পারনি। যে কোনো মানুষের কবি হওয়া আজকের পৃথিবীতে নিতান্ত দুঃখজনক। ভাবছিলাম, এতক্ষণ তুমি এই নদী আর প্রকৃতিকে নিয়ে আর্ট-হিউমার করছিলে, এতটা সিরিয়াস হবে, ভাবি নি।

—সব কিছুই তোমার কাছে আর্ট, সব কিছুই হিউমার। আমরা তেমন করে চলতে পারি নে।

—তুমি যেমন করে চলছ, সেটাও কিন্তু স্বাভাবিক নয়। নিজের জীবনটাকে সইতে পারছ না বলেই কি আমার ওপর এ রকম অত্যাচার করবে ?

—আমি অত্যাচার করছি ? এর নাম অত্যাচার ? আশ্চর্য ! মেয়েমানুষকে তার দুঃখের কথাটাও বুঝে নিতে দেবে না তোমরা ? ঠিকই তো, তোমার পক্ষে যতটা স্বাভাবিক সংগত তাই তুমি করেছ। সেদিন চায়ের নেমন্তন্নে সুমন্তবাবু এসেছিল, তোমার প্রফেসর বন্ধু, তখন আমায় গোপন চিঠির মতো আড়ালে সরিয়ে দিলে। তুমি চাইলে না আমি সামনে যাই। তোমার মর্যাদা তো আমি নষ্ট করিনি। আড়ালে থেকে কেঁদেছি। ইদ্দাতের কলঙ্কিত সীমানা লঙ্ঘন করিনি।

—ব্যস, ব্যস, ব্যস। নো মোর রাবেয়া ! আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঠিক এই কথাটাই আজ কয়দিন ধরে বলতে চেয়েও চেপে চেপে যাচ্ছিলে। কিন্তু এসব বলার জন্য নদীর মতো স্বচ্ছ প্রবাহকে দোষ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন তো দেখি না। ঘরে বসে বললেও তো পারতে। কিন্তু একটিও সত্য কথা বল নি।

—ঠিক বলেছি। সব সত্য।

ম্লান হেসে বললাম, অবিচার হচ্ছে রাবেয়া ! কী কারণে জানি না, আমার ভালোবাসাকে তুমি বার বার অপমান করছ। তোমাকে পাওয়ার মধ্যে আমার আড়ষ্টতা আছে, ভীরুতা নেই।

—মিথ্যে কথা। এসব কথায় বাঁধন আছে। আঁটুনি নেই। মুহূর্তের জন্য মন হয়তো ভোলে, কিন্তু মন ভরে না।

—যা কিছু ভাবতে পারো। মনটা কিন্তু তোমার বিকল হয়ে গেছে। সুমন্তবাবু একজন সিনিক। যে কোনো স্বাভাবিক সৌন্দর্যেই তার অবিশ্বাস, ঘৃণা। এমনিতেই সে বুঝেছে, তুমি আমার বউ। এ ব্যাপারে তার কোনো কৌতূহলই নেই। তোমাকে সামনে এনে তাকে বিরক্ত করার কোনো মানে হয় না।

—আমি যে বউ, জগতকে এ কথা বোঝাতে পারবে তুমি ?

—বাড়ির ঝি-টা কি জানে না একথা ? তুমি হীনমন্যতায় ভুগছ। বললাম, তুমি সত্যিই আমার কাছে কী চাইছ, সাফ সাফ বললেই তো পারো ? প্যাঁচপ্যোঁচ বুঝি না আমি। আর এতই যখন জ্বালাপোড়া যে কথা সহজে বুঝবে, সেটাই তবে বলি এবার। হ্যাঁ, ঠিক, তোমার মনে যা ধরবে এখন সেটাই বলি।

নৌকো এল। নৌকোয় চেপে বসলাম।

—ধর্মধ্বজীরা যতই বলুক, এই তিন মাসের পুণ্যফল, কিছুই নেই। জীবনের খানিকটা দায় বলতে পারো। নিরুপায় বাঁধন একটা। না আছে সুখ, না আছে স্বস্তি। সংস্কারের জিঞ্জীরকে ভয় হয়।

রাবেয়া মনে হলো ঠিক এ রকমই একটা কিছু তার চিন্তার সমর্থনে আমার মুখে শুনতে চাইছিল। ক্ষেপে উঠে সে বললে, ঠিক বলেছ, সংস্কার এত সহজে

নড়ে না। তুমি ছাড়লেও এর একটা সামাজিক অনুভূতি আছে। নেই?
বললাম, আছে বৈকি?
—এই অনুভূতি বার বার ভয় দেখায় একটি শিক্ষিত মনকেও। এই সামাজিক অনুভূতির সামনে ব্যক্তির মর্যাদা সোস্যাল প্রেসটিজ ভালোবাসার খাতিরে কতটা মাথা নোয়াবে আমি তোমাকে দিয়ে তার একটা পরিমাপ করেছি। কেন জানি না, আমি কেমন আঁৎকে উঠলাম।
রাবেয়া বললে, ভেবেচিন্তে দেখলাম, খুবই সত্য কথা, আমার জীবনের এই দুর্বিষহ ভার অনেক বড় মনও বইতে গিয়ে দুঃখ আর ক্লান্তিবোধ করে। এখানে সুখ কোথায়? সুখের জন্য এসেছিলাম এমন তো নয়, পাপমোচন করতে এসেছি মামুন! তোমার স্পর্শে যদি জীবনটা শুদ্ধ হয়! দায় খালাস হলেই তুমি মুক্ত, এও কি জানি নে?

সারা পথ দুজনে কোনো কথা হলো না। সন্ধ্যা নামল। চাঁদ উঠল। কালো মেঘটা মাথা ঠেলে উঠে পশ্চিম দিগন্তেই মিলিয়ে গেল। শুধু মনের মধ্যে ভাসতে লাগল, বাজতে লাগল—চিতি কোনো নদী নয়। সাপ।
বাজতে লাগল কানে, শেষ জুয়ারের পানি, তারই ফসল এই মেয়ে, বাবাজী! দামাদ যেতি না লেয়, কুন গাঙে ভাসাব এই মুখপুড়িকে, ভাবেন তো মিঞা!

আমি আর ভাবতে পারছিলাম না। পাশের ঘরে রাবেয়া কী করছে দেখতে গিয়ে দেখি তার হাতে একটি ফোটো। সেটা দেখছে এক মনে। আমাকে দেখে দ্রুত বালিশের তলায় লুকিয়ে ফেলল। সে কি তবে হামিদুলের ছবি দেখছিল? খাটে বসতেই আমার কোলে মুখ গুঁজে ফুলে ফেঁপে কাঁদতে লাগল। বললে কান্না ভেঙে পড়া সুরে, চিতি নামটা খুব মিষ্টি মামুন! বউটাও কত ভালো। নরম, বোকা। দুনিয়ার কিচ্ছু বোঝে না।
আমার এখন বালিশের তলার ছবিটা কেমন দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কেন এমন তীব্র কৌতূহল হচ্ছে, বুঝতে পারছিলাম না। রাবেয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে ফেললাম, তোমার সব কথাই হয়তো ঠিক রাবেয়া, কেঁদো না। রাবেয়া কোল ছেড়ে মুখ তুলে একবার আমায় দেখে নিয়ে, আবার মুখ গুঁজে আর্তকান্নায় গুঁড়ো হতে লাগল।

পাঁচ

সময় বইছে, সময়ের টানে। তিন মাস, অর্থাৎ গাণিতিক হিসেবে মাত্র ৯০ দিন জীবনের পক্ষে এত তুচ্ছ সময়, এত ক্ষুদ্র পরিসব, ভাবলে হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু রাবেয়া এবং আমার জীবনে এই ৯০টা দিন নানাবিধ আবেগের আবর্তে টেনশনে সরোষে স্ফীপ্ত হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে।

আরো একদিন। দুপুর বেলা। ছুটির দিন। পাশের ঘরে রাবেয়া। আমি এ ঘরে। হঠাৎ চোরের মতো উঠে গিয়ে দেখি, রাবেয়া সেই ফোটোটি হাতে ধরে উদাস হয়ে বসে আছে। লজ্জা পাবে ভেবে ফিরে এলাম নিঃশব্দে চুপি চুপি, রাবেয়া টের পেল না। আরো এক ঘণ্টা পর আবার গেলাম। রাবেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখে কান্নার বিন্দু, চোখের কোণে জমে আছে। বালিশের তলায় হাত ঢুকাতেই রাবেয়া নড়ে উঠল। আবার ভয়ে ফিরে এলাম। এবং নিজের এই আচরণে নিজেই কেমন সংকুচিত হয়ে গেছি। হামিদুলকে রাবেয়ার মনে পড়াই তো স্বাভাবিক, কিন্তু তার মনের এই দুঃখবোধকে সংগত মনে করে চুপ করে থাকলেই তো পারি, কেন অযথা অস্থির হই ? আমার মধ্যে কি কোনো ক্ষুদ্র ঈর্ষা জেগে উঠছে ?

পরের দিন এই কথা ভাবতে ভাবতে কলেজ গেলাম। কলেজে মন টেকে না, কোথায় যেন পালিয়ে গিয়ে নিরালায় বসে থাকতে ইচ্ছে করে। বয়ঃসন্ধির উগ্র প্রেমিকের নেশার মতো তরল ভাবাবেগ তাড়া দিয়ে ফেরে। ঠিক একটি স্বপ্নবেষ্টিত কাল্পনিক স্বাধীন ভূখণ্ড আবিষ্কার করি মনে মনে। যেখানে হারিয়ে গেলে কোনো বাধা থাকে না। পায়ে পায়ে শেকলে টান ধরে না। মোল্লাগাজী হাজী মৌলানা পীরজাদা কারো কোনো কুটিল ভ্রূকুটি নেই। হাদিস মছলার ফতোয়া যে পৃথিবীকে পঙ্কিল করেনি। বাস্তবকে মোকাবিলা করার যখন কোনোই পথ থাকে না, তখনই সে স্বপ্নিল ভূখণ্ড জলের তথা থেকে মাটির আস্তরণে আভাষিত হতে থাকে। সমাজের বাধানিষেধে চাপা পড়ে ভেঙে যাওয়া ব্যক্তির মন এইভাবে স্বপ্নের রাজ্যে পালাবার পথ খোঁজে।

তবে কি আমি হেরে যাচ্ছি ?

একটিমাত্র ক্লাশ নেবার পর কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। কলেজ ক্যান্টিনে ভিড় দেখে সেদিকে গেলাম না। বুড়া রসিদ রিকশা-অলাকে পথে পেয়ে গেলাম। মন খারাপ থাকলে বুড়া রিকশা-অলাকে আমার ভালো লাগে।

ঠুক্‌ঠুক্‌ করে পথে পথে ঘুরতে মনে আরাম পাই। দুঃখের ভার তাতে খানিক হালকা হয়। পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের হয় কিনা জানি না, এ রকম টানা রিকশায় পথে পথে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর একটা কিন্তু নেশা আছে, খানিকটা পালিয়ে বাঁচার স্বস্তি মেলে তাতে।

খানিক দূর আসার পর নন্দীর কাপড়েব দোকানের সামনে রসিদকে দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লাম। বললাম, দাঁড়াও আসছি, বলে দোকানে ঢুকে স্বল্প সময়ের পছন্দে দামী সায়া ব্লাউজ কিনলাম। কিনতে ভালো লাগল, তাই কিনলাম। না কিনলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। আবার উঠলাম রিকশায়।

বললাম, চলো!

—কোথায় যাব? তহ্‌ বাজার?

—যেদিকে খুশি। চল তো!

রসিদ বেঁটেখাটো মানুষ। ডান পা ঘায়ে পুঁজে বিষাক্ত, পঙ্গু, ওতেই নেচে নেচে রিকশা টানে। দেখলেই মনে হয়, হাঁপাচ্ছে, ধুঁকছে। রসিদ ঘন্টি বাজিয়ে দিয়ে চলতে লাগল।

প্রায় একঘণ্টা চলার পর শহরের দক্ষিণপ্রান্তে কলেজ পাড়ার প্রাচীন রেস্তোরাঁ অনিন্দিতায় এসে থামল রসিদ। বললাম, স্ট্যাণ্ডে গিয়ে চা খাও। এই নাও, টাকা নাও। খদ্দের পেলে চলে যেও। ঘণ্টা দেড ঘণ্টা পর একবার পারো যদি আসবে। এখানেই থাকব।

অনিন্দিতায় চায়ের দর একটু বেশি। নানা রকম টোস্ট, সিঙাড়া, চপ, রোল খেতে পারি। রসিদ সস্তা দোকানে চা খেয়ে নেবে। আমি দোকানে ঢুকলাম, হাতে কাপড়ের বড় প্যাকেট, 'নন্দী বস্ত্রালয়' সাথে রইল। এখন দুপুর একটা। কেবিনে ঢুকেই চমকে গেলাম। আজ ৫/৭ বছর বাদে দেখলাম ওকে। চিনতে একটু কষ্ট হয়েছিল। চোখে চশমা আগে ছিল না। মাথায় এত চুলও ছিল না। কবি কবি দেখাচ্ছে ওকে। ভারিক্কি মাংসল হয়েছে আদল। বয়সেরও ছাপ পড়েছে সামান্য। সামনাসামনি বসলাম। হাতে হীরের আংটি মনে হলো। ঘড়িটা চকচক করছে সোনালী আভায়। বসতেই চোখ তুলে তুলে নরম করে দেখল আমাকে। চোখের ইশারা করে শুধালো, ভালো তো?

এ রকম করে অপরিচিত, ঘনিষ্ঠ কেউ ঢের দিন বাদে ইশারায় দূরত্বে রেখে কুশল শুধালে বন্ধুকে অহংকারী এবং নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়, আঘাত লাগে। তবুও বসলাম। বন্ধু এবার দোকানের ছেলেগুলোকে ডাক দিয়ে কি সব মূল্যবান খাবারের নাম করলে। ছেলেটা প্লেট সাজিয়ে ফিরবে এখনই। চন্দন সোম শুধালো, এই কলেজে চান্স পেয়ে গেলে, শুনেছি। কোথায় আছ? খুঁজছি

অনেক মনে মনে। বাড়ি ভাড়া করে আছ, খবর পাই! শুধালাম, তুমি এখন কী করছ? বিজনেস?

—হ্যাঁ। বাবা আরো একখানা নতুন বাস কিনলেন। আমি অবশ্য লরিতে থাকি। সেই বোহেমিয়ান ভূতটা এখনো তোমাদের সেই মনকির নকীর ফেরেস্তার মতো ঘাড়ে বসে আছে। শরৎচন্দ্র পড়ে ছেলেবেলায় নষ্ট হয়েছি। তোমরা বলতে না, ভ্যাগাবণ্ড দি গ্রেট! সে-সুবাদে আমি জগতকে চিনেছি। নেশা কাটে নি। তোমাকে পেয়ে, আজ খুব ভালো হলো। ভেব না, টাকা থাকলেই মানুষ এরকম হয়। জানো আজও আমি বিয়ে করে উঠতে পারলাম না। অনেক কথা আছে তোমার সাথে। ডায়েরীতে তোমার ঠিকানাটা টুকে দাও। ইয়ে মানে লিখে দাও।

আস্তে আস্তে দূরত্বটা ঘুচিয়ে দিচ্ছে সোম। বন্ধুর বুকের উত্তাপ পাচ্ছি। এই ওর স্বভাব, মুহূর্তে মানুষকে আপন করে নেয়। খাবার এল।

খেতে শুরু করে বললাম, মানিকতলায় থাকি। ওখানে গেলেই যে কেউ আমার বাসা দেখিয়ে দেবে। যেও নিশ্চয়। আমারও অনেক কথা আছে।

—কথা থাকারই কথা। কলেজে পড়তাম এক সাথে। স্কুলেও এক সাথে। ছাড়াছাড়ি হলো, সেই কবে যেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তুমি। না, তারও আগে। কলেজ থেকে ভাগলাম। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। তার পর সব ছন্নছাড়া, কে কোন দিক ছিটকে পড়েছি। তুমি কিন্তু জীবনে ঢের উন্নতি করেছ। ভালো লাগছে ভাবতে, তুমি একজন সাহিত্যের অধ্যাপক। খাও! খাচ্ছ না কেন?

—খাচ্ছি তো। এই তো! বললাম মৃদু হেসে। সোম চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে তাকালো। কিছুক্ষণ আমার মুখের ওপর চেয়ে থেকে বললে, তুমি খুব অন্যমনস্ক হয়ে আছ। বাড়িতে কোনো অশান্তি করেছ নাকি?

বললাম, নিজেকে আড়াল করে, তা একটু হচ্ছে বৈকি!

সোম বললে, সংসারটাই ঐ। ঝকমারি। খাণ্ডার বউ হলে তো কথাই নেই। প্রফেসর বোলারকে তোমার মনে পড়ে! কাঁধের কাছে বেরিয়ে থাকত ছেঁড়া ন্যাতার মতো গেঞ্জি, বউ-এর অনাদর স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

বললাম, না, সে সব কিছু নয়। বউ খুব সতর্ক।

সোম হঠাৎ খানিক চুপ করে থেকে শুধালো, তোমার সেই রাবেয়ার খবর কি?

—আমার কাছেই আছে এখন!

—আছে মানে? চমকালো চন্দন সোম। রাবেয়ার হামিদুলের সাথে বিয়ে

হয়েছিল, নয় ?

—হয়েছিল।

—তবে ?

—বলছি কী। এখন আমার কাছেই রয়েছে। হামিদুল ওকে তালাক দিয়েছে।

—সেকি ! মুহূর্তে সোমের চেহারা আরো গম্ভীর আর স্তব্ধ হয়ে গেল। পাথরের মূর্তির মতো নির্বাক হয়ে চশমার মধ্য দিয়ে নিষ্প্রাণ চেয়ে রইল দেওয়ালের নেতাজীর ক্যালেণ্ডারে।

আমিও আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগলাম। খাওয়া শেষ হলে পথে নামলাম দু জন। দামী সিগারেট খেতে দিল সোম। ভাজা মসলার সুরভিত পান দিল। তার পর বললে, আবার আসছি এ মাসের শেষের দিকে। ২৭-২৮ তারিখে দেখা করবো এসে। মানিকতলা, না ? আজ কত তারিখ ?

আঙুলের গ্রন্থি গুনে দেখলাম, আমাদের দাম্পত্যেরও আজ ৮০ দিন চলছে। বললাম, আজ ১৭ তারিখ।

সোম বললে, তার মানে আর দশ দিন।

বললাম, হ্যাঁ। মাত্র দশ দিন।

সোম বললে, আফটার টেন ডেজ আই মাস্ট কাম। সিওর। ২৭ অর ২৮। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সোম রিকশায় উঠে পড়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। রসিদ এদিকে আসছে। কাছে এলে রিকশায় পা তুলে উঠতে যাব, এমন সময় বাঁদর খেলানো ভিড়ে হামিদুলকে দেখে চমকে উঠলাম। পা নামিয়ে বললাম, থাক রসিদ। এখন যাচ্ছি না।

কিন্তু হামিদুল শহরে কেন এল ! সেকি আমার বাসায় গিয়েছিল ? হামিদুল আমাকে কি দেখতে পেয়েছে ? ভিড়ের মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে ওদিকে কোথায় যাচ্ছে, আর এত দ্রুতই বা ছুটছে কেন ? হাতে ওটা পলিথিনের ব্যাগ, জামাকাপড় আছে। নিশ্চয়ই রাবেয়াকে দেখা করতে এসেছে। কলেজের দিকেই তো যাচ্ছে মনে হচ্ছে। নাহ্, এভাবে দাঁড়িয়ে বোকার মতো চেয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। ওর নাম ধরে ডেকে উঠলেই বা ক্ষতি কি ছিল ? কিন্তু এখন তো আর শুনতে পাবে না। চেঁচিয়ে ডাকলে লোকে অসভ্য ভাববে। ছাত্ররা এদিকে এতদূরে কোথাও ছিটিয়ে অফ পিরিয়ডে হাওয়া খেতেও চলে আসে। চিৎকার শুনলে হাসাহাসি করবে। দৌড়ে যাব নাকি ? দৌড়লে তো চোরের পেছনে ছোটা হয়। ছুটলে পর ছাত্ররা 'কি হয়েছে স্যর' বলে ছুটে আসবে। রসিদও

হাওয়া হয়ে গেছে। যত দ্রুত হয় পায়ে হেঁটেই ওকে ধরতে হবে। কলেজে গিয়ে নিশ্চয়ই আমার খোঁজ করবে।

ছুটলাম। কলেজের চৌমাথায় এসে হামিদুল বাঁয়ে ঘুরল। এ পথে কেন? কোথায় যাবে? ও নিশ্চয়ই আমাকে দেখেছে, নইলে এত জোরে ছুটছে কেন? সে কি আমাকে দেখা দিতে চায় না? অভিমান? লজ্জা? অপরাধবোধ? ছুটতে ছুটতে কম পথ আসা হলো না? এদিকে চিতির রাস্তা। চিতির ওপারে কোথায় যাবে হামিদুল? কেন যাবে? ফুলমতির কাছে যাবে কি? কেন? নাহ্! ভাবা যায় না। ভাবা ঠিকও না। কিন্তু ও কেন বুঝছে না, আমি ওর পিছু পিছু ছুটে আসছি!

ছুটতে ছুটতে আমি চিতির কিনারায় এসে পড়লাম। ততক্ষণে হামিদুল নৌকোয় চেপে নদীর মধ্যভাগে চলে গেছে। ডেকে উঠলাম, হামিদুল! হামিদ!

হামিদুল সাড়া দিল না। ওপারে নৌকো থেকে নেমে ফিরেও চাইল না।

হামিদুল কেন এ রকম করলে বুঝে পাইনি। ফিরে এলাম বাড়ি। আমার মনের প্রকৃত অবস্থা কারোকে বলে বোঝাতে পারব না। কেউ ঠিক বুঝবে না। হামিদুলের সাথে আমার কত যে কথা ছিল, হামিদুল শুনল না কেন? বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, রাবেয়া ঘুমিয়ে রয়েছে আমার খাটে। বালিশের পাশে সেই ফোটোটা। ঝুঁকে পড়ে দেখি, হামিদুল নয়, এটি একটি বাচ্চার ছবি। আশ্চর্য এক বিমূঢ় বোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে চেয়ে দেখলাম। হঠাৎ রাবেয়ার চোখ খুলে গেল। কিছুক্ষণ আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বালিশ থেকে মাথাটা আমার কোলে তুলে দিয়ে দু হাতের আবেষ্টনীতে আমার কোমর জড়িয়ে দুই চোখ বন্ধ করে নিঃসাড় হয়ে রইল। এমনই শক্ত করে চেপে ধরেছে! মনে হলো, সে কিছুতেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। সে এতক্ষণ আমারই মুখ মনে করে চোখ বুজে কাঠ হয়ে পড়ে ছিল।

মাথার চুলে আঙুল ডুবিয়ে রাবেয়াকে মৃদুস্বরে ডাক দিই। রাবেয়া 'উঁহু' বলে পাতলা সাড়া দেয়। বুঝতে পারি, রাবেয়া উঠতে পারছে না। চিতি থেকে ফিরে এসে আমায় ভালো করে কথা বলেনি। অন্যমনা উদাসীন হয়ে কোথায় নিজের মধ্যে নির্বাসিত হয়েছে। মৃত পুত্রের স্মৃতি আঁকড়ে আছে।

ডাকলাম, উঠবে না তুমি?

—উঁহু!

—উঠবে না?

কোনো কথা নেই। চোখ খুলে মেঝেয় নিষ্পলক চেয়ে আছে। ওর মাথাটা

আস্তে করে বালিশে নামিয়ে দিয়ে বললাম, ওঠো ?

—উঠছি !

—তিনটে বেজে বিশ। একটু মুড়িটুড়ি দাও, খিদে পেয়েছে।

—দেব।

উঠে বসল রাবেয়া। মাথার এলোমেলো চুলগুলো টেবিলের চিরুনি টেনে আয়না ধরে পরিপাটি করে বাঁধল। তার পর খাট থেকে নেমে গেল নিঃশব্দে। খাটে ছড়ানো উলের বল সুতো কাঁটার বিশৃঙ্খলা। একটু গুছিয়ে দিলাম। কিন্তু নিজের মনটাকে এত অগোছালো করে তুলেছি, যাকে আর কিছুতেই গোছানো যায় না। ভাবছিলাম, অ্যাদ্দিনেও সোযেটারটা কেন রাবেয়া বুনে উঠতে পারল না। ও কি বোনে আর খুলে ফেলে ? রাবেযা মুড়ি মেখে নিয়ে বাটিতে এনে রাখল। মুখ ধুয়ে তোয়ালেয় মুছে পরিষ্কাব হয়েছে। বাটিটা খাটের উপর রেখে টেবিলের কাছে সরে গিয়ে একটু স্নো ঘষল মুখে।

বললে, এই তিন মাসে আমার বয়েস অনেক বেড়ে গেছে, মামুন !

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসলাম। মুড়ি মুখে দিয়ে বললাম, তুমি খাবে না ?

—না। তুমি খাও।

—ফুলমতি বিকালে আসবে না ?

—আজ বকুল তলার হাট। বলেই এ· টু থেমে রাবেয়া বলে উঠল, আমি আর দশদিন বাদেই ফিরে যাচ্ছি। দে উ৺ল কাম। ফুলমতিকে বলতেই, না ইংরেজিতে নয়, বংলাতেই বললাম, বলতেই আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে মুখটা ওর পাংশু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে, তুমার দুঃখে বুবুজান, বনের পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, আসমানের তারা, নবীর কেতাব কুরানও কাঁদবে। গাছগাছালীরও শোগ চাপে বুবুমনি !

—পথের শেয়াল কুকুর কী দোষ করলে, ওরা কাঁদবে না ? রাবেয়া এই কথাটা জুড়ে দিয়ে বললে, শুধালাম, কাঁদবে না, ফুলমতি ? কাঁদবে নবীর কেতাব কুরান ! হুঁ !

রাবেয়া হাসতে লাগল। স্বর্ণালী কিরণ সন্ধ্যার পশ্চিম থেকে এসে মুখে লেগেছিল, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। রাত্রি এল ঘরের দুয়ারে।

আমার মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। রাবেয়া মধ্যরাত অবধি কপাল টিপে দিল। কখন ঘুমিয়ে গেলাম ! রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছিলাম,

রাবেয়া আমার পায়ের কাছে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে, ঘুমিয়ে রয়েছে।

ছয়

ছবিটা পকেটেই ছিল। স্টুডিও অজন্তায় ঢুকলাম এসে। দেখিয়ে বললাম, এটা এনলার্জ করে দিতে হবে। জানতে চাইলে কবে নেব। বললাম, কাল পেলে কালই।

এক সপ্তাহের আগে দেয়া যাবে না। আজ সোম, পরের সোমবার এনলার্জ করে বাঁধিয়ে রেখে দেব, নিয়ে যাবেন, ৩৫ টাকা লাগবে।

কলেজে এলাম। দুটি পিরিয়ড বাদে আমার কোনো ক্লাশ ছিল না। বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে পায়ে হেঁটে এলাম প্রায় এক মাইল। মন ভালো না থাকলে যা হয়। স্কোয়ার ফিল্ড এর কাছে পথিক-গাইয়েরা আসর বসিয়েছে। দাঁড়িয়ে শুনছি, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন নাম ধরে ডেকে উঠল। পিছন ফিরে অবাক হয়ে দেখি, শরীফ সাহেব, গাজীপুরের খতিব। গতকাল হামিদুল। আজ খতিব। নিশ্চয় কোনো ব্যাপার চলেছে ভেতরে আড়ালে। হাত ধরে টেনে এনে তুললাম একটি রেস্টুরেন্টে। প্লেট ভর্তি খাবার খতিবের সামনে। বললাম, ভালো তো খতিব সাহেব?

—মাশাল্লাহ্!

—এখানে কী মনে করে, বাজার-টাজার করতে বুঝি? আজ ২ মাস ২০/২১ দিন হয়ে গেল, একবারও আমাদের খোঁজ নিতে পারতেন?

খতিব আরাম করে খেতে খেতে বললেন, এই সময়টাই গাঁ পল্লীতে বিয়েটিয়ের ঝুম লাগে, পাটফাট উঠেছে, বুঝলে না? তা ছাড়া পাচ-পাঁচটা কুলখতমের, ঐ শ্রাদ্ধ আর কি, তার খানাপিনা, বুঝলে না? তবে, তোমাকে তো আমি একটা ফরমূলা দিয়ে গেছি ভাই! সেই মতো কাজ হচ্ছে তো? শিকদার আমাকে এইজন্যেই পাঠালে।

—আপনার ফরমূলাটা কী?

—তার মানে? তুমি দেখছি আমার কোনো কথাই মনে রাখনি।

—কি বলেছিলেন আপনি?

—দেখ! তালাক হচ্ছে শত প্রকার! আর তুমি হলে ফরাজী, আহ্‌লে হাদিস! আর ইদ্দৎ হচ্ছে, জায়গা খালি করা, অপেক্ষা করা, দিন গুনে গুনে চলা। একটি পবিত্র সময়ের জন্য অপেক্ষা করা এবং সেই সময়টিকে ব্যবহার করা। রাবেয়ার ইয়ে হয়! হায়েজ, মিন্‌স্!

বললাম, জানি নে তো !

—কেন জান না ? সে তোমার বিবি । জানা উচিত ছিল । তুমি কি চাও না, মেয়েটি হামিদুলের গেরস্তালীতে ফিরে যাক ! হামিদুল তোমার দোস্ত । আল্লার দোস্ত নবীজী । তোমাকে মাসে মাসে তালাক দিতে নির্দেশ করে গেছি । তুমি ফরাজী, আহ্‌লে হাদিস ! হানাফী হলে এক রাত সহবাস করতে, ছেড়ে দিতে ।

—দেখুন খতিব সাহেব, আমি ফরাজী নই, হানাফীও নই । আমি মানুষ । আপনার হাদিসে আমার জন্য ভালো কোনো শালীন কিছু রয়েছে কি ?

ক্ষেপে উঠলেন খতিব । বললেন, দেখ মামুন ভাই ! তোমার সাথে কোনো তর্ক করতে আসিনি । জানতে এসেছি, তুমি কতদূর এগোলে । দু মাসে দুটি তালাক দিতে পেরেছ কিনা ! অথবা রাবেয়ার পেটে বাচ্চা দাঁড়িয়ে গেছে কিনা ! দাঁড়িয়ে গেলে, আমি আর দাঁড়াব না ভাই ! তা হলে শিকদার রাবেয়াকে নেবে না । রাবেয়া তখন পার্মানেন্টলি তোমার । হামিদুল ফক্কা । তখন আর ইদ্দাতের অপচয় করে লাভ কী ?···হামিদুলের পয়সায় তুমি মানুষ হয়েছ, তোমার বাচ্চাও কি মানুষ হবে ? কাগের বাসায় বগের ডিম । কিন্তু তুমি নেমকহারাম নও !

আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, এ কথা কার ? আপনার নাকি শিকদারের ?

খতিব বললেন, কথা হচ্ছে হাদিসের । এ কারো চৌদ্দ পুরুষের কথা নয় ।

—তাই যদি হয়, এক রাত্রির পর রাবেয়াকে নিয়ে গেলেই তো হতো !

—কেন তুমি বুঝলে না মামুন ! তুমি ফরাজী । হানাফী নও । হুট্ করে কারুকে তুমি ছাড়তে পার না । ইমাম শাফী রহমতুল্লা আলাহে···

—থাক । খতিব সাহেব । আপনার আর দাঁড়িয়ে থেকে ফায়দা নেই । আপনি আসুন । হামিদুল কোথায় ?

—সে কোথায়, বাড়িতে খবর নেই । কোথায় কোথায় ঘুরছে ! এর আগে তিন মাস দশ দিন তার ইদ্দাতে গেছে । ইদ্দাৎ মানে হচ্ছে শোক করা, মনস্তাপ করা, ওয়েট করা, যাকে বলে প্রতীক্ষা, দ্যাট ইজ হার্ডার দ্যান ডেথ । তাই সে পাগলের মতো ঘুরছে । তোমার দোস্ত । আল্লার দোস্ত নবীজী !

রেগে উঠে বললাম, শিকদারের কত টাকা খেয়েছেন, আপনি ? এখন আমি আপনাকে কত টাকা দেব ? একটা ভালো ফতোয়া দিন । রাবেয়াকে রক্ষা করুন খতিব সাহেব !

—রক্ষা তুমিই করবে, শোন, মামুন ! ইট ইজ ইওর ইনসাফ ! তালাক যদি না দিয়ে থাক, আজই গিয়ে তালাক দাও । দুটি দাও এক সাথে । আমরা যেদিন নিতে আসব, সেদিন দেবে একটি । আমি পয়সার ভুখা নই । আমি আল্লার গুলাম । নবীর উম্মত্ ।···

খতিবের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। চা এল। চায়ে চুমুক দিলেন তিনি। তাঁর মুখের দাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। স্বর্গীয় বিভূতি উৎসারিত হচ্ছে। নিষ্পাপ সারল্যের পেছনে সাপের মতো চেরা জিভের লকলকে ছায়া ভাসছে যেন। এদের মুখে অশ্লীল কোনো কথাই আটকায় না। মুসলিম নারীদের নিয়ে ফতোয়া দেয়ার কুটিল ব্যবসায় এদের সুখ্যাতি প্রচুর। এদের উপর সমস্ত আক্রোশ নিষ্ফল হয়ে যায়, বার বার এরা জেতে। কেন জেতে সমাজ তা জেনেও কিছুই করতে পারে না। আমাকে এই লোকটি ফাঁদে ফেলে বেঁধেছে। হামিদুলকেও খেলিয়ে নিয়ে ফিরছে। শিকদারকে নাচাচ্ছে। শিকদারও আপন মহিমায় নেচে চলেছেন। আর এদিকে আমার খেয়ালই ছিল না, আমি ফরাজী, আমি একই মুহূর্তে তিন তালাক দিতে পারি না। রসুলের হাদিসে নাকি এক সাথে তিন তালাকের সমর্থন নেই। থাকলেও কোথায কেমন হয়ে রয়েছে, তার ফতোয়া আমার মতো মূর্খ অধ্যাপকের জানা নেই। আমি আসলে নেমকহারাম নই, এই সুবাদে আত্মহননে লিপ্ত হয়ে নিজেকে খুঁড়ছি আর মন্থন করছি ব্যথিত হৃদয়, বিপন্ন করছি নিজেকে নিজে।

পথে নেমে এসে খতিবকে একটা পান দিলাম কড়াগুণ্ডি মসলার। মুখে পুরে পিচ করে পিক্ ফেললে শরীফ সাহেব। থুতনির দাড়িতে পানের পিকের পোচ লেগে গেল। শুধালো খতিব—তা হলে, আমরা কবে আসব?

—আপনি নিজেই জানেন আপনাকে কবে আসতে হবে। আমি ফরমূলা মতো কাজ যদি নাই করতে পারি, তবে তার শুদ্ধি হবে কী ভাবে, তাই ভাবছি। আর ভাবছি, পরকালে কুলখতমের খানাপিনার হালটা কেমন হবে? সেখানে শুনেছি পুরুষ-প্রতি ৭০ জন হুরীর বরাদ্দ থাকবে। সেখানকার ইদ্দাৎটাই বা কোন্ ফরমূলায় পালন করা হবে! একজন জান্নাৎবাসীর জন্য কী অঢেল আয়োজন, ভাবলেই তাক লাগে। পরকালে সত্তরজন হুরী আর ইহলোকে স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হচ্ছে স্ত্রীর বেহেস্ত। একজন পুরুষের বিস্ময়কর সেক্স-অ্যাবিলিটি, পশুর চেয়ে বীভৎস। সত্তরজন হুরী। অপ্সরী। ভয়াবহ কামবিকার, মাফ করবেন খতিব, এত অশ্লীল কথা।

বলেই চলেছি আপন খেয়ালে, হঠাৎ খেয়াল হলো, গাজীপুরী মোল্লা উধাও হয়ে জনস্রোতে হারিয়ে গেছেন, তাঁর ফরমূলাটা আমার আরো নিখুঁত করে বুঝে না নিয়ে এভাবে চটিয়ে পটিয়ে তাড়িয়ে দেয়া বোধ হয় ঠিক হলো না। ফাঁদে পড়েছি, ফের আহামকী হলো!

পায়ে পায়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এদিকটায় কখনো আসি না।

পুরাতন বাজার এদিকে। সোনাপট্টির মার্কেট। ছাগল গোরুর হাট। পাশেই মেছো বাজারের মোড়। আরো খানিক গেলে সবচেয়ে পুরাতন প্রেক্ষাগৃহ উদয়ন। তার পাশে ওমেগা প্রেস। ঠিক এইখানেই একটি উলের দোকানে দাঁড়িয়ে ও কে? হামিদুলই তো! কী করছে? উল কিনছে? হাতে সেই পলিথিনের ব্যাগ। কেমন উসকো-খুসকো চেহারা। তবে কি ওরা দু জন এক সাথে এসেছে? হামিদুল উলের দোকান ছেড়ে রিকশায় চড়ল। আজ ওকে কিছুতেই হারাতে পারি না। একটি রিকশা ডেকে নিয়ে দ্রুত লাফিয়ে উঠে পড়ে বললাম, সামনের রিকশাটা দেখছ?

—কোন্‌টা?

—ঐ যে সবুজ কাপড়ের ডালা তোলা, আটশো কত যেন নম্বর।

—খলিলের গাড়ি ওটা।

—ধরো তো।

খলিল অনেক দূর এগিয়ে গেছে নিমেষে। হামিদুল নিশ্চয় আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কেন বুঝছে না, তাকে আমার কত প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি চলো ভাই। টেনে চলো একটু।

রিকশা আবো তেজে হাঁকিয়ে চলল রিকশা-অলা। পাঁচ রাহার মোড়ে এসে লোকটি রেস্ট্রি অফিসের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি গলির মধ্যে ঢুকে গেল। আমাকে ঢুকতে হলো গলির মধ্যে। এ গলিটা তো নাকড়তলা আর লাটাইপুরের চৌমাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, তার পরেই তো বালির ঘাট। যাবে কোথায় হামিদুল, ওপারে দুর্লভপুরে তার কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় আছে কি?

নাকড়তলা, লাটাইপুরের চৌমাথায় চায়ের দোকানে হামিদুল দাঁড়িয়ে পান কিনছে। পেছন থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম, হামিদুল?

ঘুরে দাঁড়াল সে। কিন্তু একি! কার পেছনে এতক্ষণ ছুটে মরছি আমি? এসব কী করে বেড়াচ্ছি পাগলের মতো? এতটা বিভ্রমে পড়ার কারণ কী হতে পারে? এ যে অন্য লোক, একটুও কেন ধরতে পারি নি? পেছন থেকে দেখতে এত হুবহু মিল হয় কী করে? মনে হলো, আপন মনের ছায়াকে দেখে ভয় পেয়েছি আমি। গায়ে ঘাম দিচ্ছে। গলা শুকিয়ে গেছে। পেছন থেকে দেখতে হামিদুলের মতো কোনো একটি লোক পৃথিবীতে আছে, যে আমার মনের ছায়ার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে বাঁদব খেলার ভিড়ে, উলের দোকানে, গলিতে মোড়ে চৌমাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে কী বলতে চাই? কী কথা আছে, তার সাথে? দেখ্ হামিদুল, তুই কি সত্যিই আর রাবেয়াকে চাস না? শিকদার তোকে কি বলে কনভিন্স করছে? তোর নিজস্ব কোনো অভিমত নেই? যে-রাবেয়াকে

পেলে আমি জীবনভর বর্তে যেতাম, তাকে তুই পেয়েছিস, কেন তবে দুঃখ তোর ? তুই কি আমাকে বিশ্বাস করতে ভয় পাস ? ধর দে, চুপ করে থাকিস নে !

মনের ছায়াকে এই সব কথা শুনিয়ে উত্তর মেলে না : রক্তমাংসের হামিদুল হলে নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করত ! ছায়া কখনো মানুষকে বিশ্বাস করে না। আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না পেতে লাগল। এই যে মনের আবর্ত, ঘোর বিমূঢ়তা, বুকে পিনফোটানো আর্ত আকুল কান্না, এর কোনো সাক্ষী নেই। রাবেয়াকে কি কোনো কথা বলা যায় এখন ? সে আমাকে ভুল বুঝবে না তো ? বাড়িতে ঢুকতেই আমার চোখ মুখের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখে শিউরে গেল রাবেয়া। কী হয়েছে আমার ? জানতে চাইল। দ্রুত হাতপাখার বাতাস দিতে লাগল। এই হালে পড়ে প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে লাগল। বার বার প্রশ্ন করে, কী হয়েছে তোমার, বলবে না ? কোথায় ছিলে এতক্ষণ, কেউ কিছু বলেছে তোমাকে ? কেন তুমি ওদের সাথে কথা-কাটাকাটি করতে গেলে ?

গম্ভীর হয়ে বললাম, আমি কারো সাথে কথা-কাটাকাটি করিনি।

—দরকারই বা কি ! আর মাত্র ক-টা দিন। এই দিনগুলো ভালোয় ভালোয় যেতে দাও।

—আচ্ছা ! খতিব এসেছিল, দুপুর বেলা !

—না তো !

—দেখো রাবেয়া, আমার কাছে কোনো কিছু গোপন করো না।

—কী বলছ তুমি মামুন ! কী হয়েছে, আমাকে খুলে বলো। খতিব কেন আসবে ?

—আসে নি ?

—না।

—তবে ?

—তবে কি ?

—কিছু না ! কোনো কথা জানতে চেও না।

—বেশ। জানব না। আগে একটু স্থির হও তুমি।এক-টা দিন একটু ভালো থাকো !

—ভালো থাকব কি ? তোমাকে এখন আমি তালাক দিচ্ছি রাবেয়া ! দুই মাসের দুই তালাক এক সাথে দিচ্ছি। তালাক। তালাক। হলো তো !

—বেশ হয়েছে। তালাক হলো। আর এক তালাক তোমার হাতে রইল। ওটাও দেবে সময় মতো।

রাবেয়ার চোখে কান্না চিক চিক করছে। ঠোঁটে হাসির প্রলেপ।

বললে, তোমার ভালোর জন্যে, তুমি আমাকে হাজার তালাক দিতে পার মামুন !

বললাম, তোমাকে আমি অত্যাচার করছি।

—করছ, ঠিকই করছ ! আমি মুখ বুঁজে সইছি।

—রাবেয়া ?

—বলো !

—তোমাকে আমি সইতে পারছি না। আই হেট ইউ।

—ঘৃণা করে সুখ পেলে, তাই করো !

এই সব কথা শুনতে শুনতে আমার হাউমাউ করে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়। অথচ কেঁদে উঠতে পারি না।

রাবেয়া বলে, আর মাত্র আট নয় দিন তোমার সংসারে থাকব। কখনো অসম্মান করনি। এখন বিরক্ত হলে, দোষ দেব না। জানি, আমার জন্যে পথেঘাটে অনেক নির্যাতন সইতে হচ্ছে। সামান্য বুদ্ধির মানুষও এ কথা ধরতে পারে।

রাবেয়া দ্রুত ছুটে গিয়ে চা করে আনল। একটু চা খাও। চা ছাড়া আর কী দেব তোমাকে ? শান্ত হয়ে একটু শুয়ে থাক। শুয়ে পড ?

চা খেয়ে সটান শুয়ে গেলাম। চোখের প্রান্তে গাল বেয়ে কান্না নামতে লাগল। রাবেয়াকে আমি তালাক দিলাম। দুই তালাক দিলাম। ভেতরের দুর্দমনীয় অস্থিরতা ঐ দুটি শব্দের উচ্চারণে থুৎকারের মতো বাইরে ছিটকে এল। কিন্তু কোনো যন্ত্রণা প্রশমিত হলো না।

রাত্রে খেতে বসে মাথাটা খানিক জুড়িয়ে এসেছিল। বললাম, আমি তোমাকে দুই তালাক দিয়েছি। মাইণ্ড দ্যাট।

চোখ নামিয়ে পিঁড়িতে বসে থাকা রাবেয়া মেঝেয় নখ ঘষতে লাগল। সত্যিকার তালাকের প্রতিক্রিয়া কি এই রকম নিঃসহায় ? এই রকমই প্রতিবাদহীন, বধির ?

—রাবেয়া ?

—বল ?

—তুমি কিছু বলবে না ?

—কি বলব বল ? তোমার কষ্ট দেখে, আমি কি বলব, বুঝতে পারছি না, মামুন ! মাথা তুলল না রাবেয়া। আমি থালাতে জল ঢেলে হাত-মুখ ধুয়ে আমার নিজের খাটে চলে এলাম। আমাকে ভুল বুঝলেও, আমার কোনো উপায় ছিল

না। রাবেয়া অনেকক্ষণ আমার কাছে এল না। যখন এল, দেখলাম, চোখ দুটো ফোলা, অসুস্থ হয়ে উঠেছে।

মেঝেয় সপ বিছিয়ে বসল রাবেয়া। হাতে প্রায় বুনে শেষ হয়ে আসা সোয়েটার, বল-কাঁটা, পাশে ছোট চামড়ার ব্যাগ। বুনতে শুরু করল। চেয়ে দেখতে দেখতে কেমন মায়ায় আপ্লুত হচ্ছিল মনের তাবৎ পটভূমি। তালাক দিলাম। যে তালাককে এতটুকু সহ্য এবং বিশ্বাস করতে পারি না। আমাকে সেই অশুদ্ধ শব্দের নাম মুখে বলে একটা পাষাণ ভার নামাতে চাইলাম কেন ? কেন মনে হলো, রাবেয়াকে আমায় এইভাবেই ত্যাগ করতে হবে ? রাত বাড়তে লাগল। রাবেয়া কোনো কথা না বলে বুনে যাচ্ছে আপন মনে নির্বিকার। বাইরে প্রস্ফুটিত দুধেল জ্যোৎস্না। শূন্য আকাশে গেঁথে আছে শরতের চাঁদ।

বললাম, আমি হামিদুলের পয়সায় মানুষ হয়েছি, এই কৃতজ্ঞতায় মনটা আজ ভরে গেছে, রাবেয়া !

বাবেয়া অবাক হয়ে মুখ তুলল একবার। একটুখানি হাত থেমে গিয়ে আবার চলতে লাগল। কোনো সাড়া দিল না।

বললাম. সারাটা দিন আজ কি যে হলো, পাগল হয়ে গেলাম। একলা একলা কোথায় যে ছুটে ছুটে গেলাম !

—কেন এমন হচ্ছে, মামুন ! কিসের যেন কষ্ট পাচ্ছ ! আমাকে খুলে বল, আরাম পাবে। আমি সব সইতে পারব।

—সওয়া না সওয়ার কথা নয়। আমি যা বিশ্বাস করি না আমাকে তা করতে হচ্ছে কেন ?

—ভালোবাস বলে ! কারো কোনো খাতিরে কিছু করনি তো ! করেছ ? ভালোবেসে মানুষ তো এ রকমই দুঃখ পায়। তুমি হামিদুলকে ঘৃণা করলেও পারতে !

—আমার এখন ঘৃণা করতেই ইচ্ছে হচ্ছে। সে আমার সাথে একবার দেখা করতে কি পারে না ?

—বুঝেছি, হামিদুলের জন্যে মন খারাপ। সে তো এল বলে।

—তোমার মন খারাপ হয় না ? শুধালাম আমি।

—এখন আমার কি হয়, কি হয় না, কিছুই বুঝতে পারি না। কেবল বুঝি, একটা পাঁকে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমাকে টেনে টেনে তুলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আর আজ স্মরণ করিয়ে দিলে, আমাকে ফিরতে হবে, তুমি আর পাঁক ঘাঁটতে পারছ,না। তালাক শব্দটার প্রকৃত মানে যে কী মর্মান্তিক হামিদুল যখন তালাক দেয় বুঝতে পারি নি, আজ বুঝলাম। এবং আশ্চর্য হলাম, তুমি

আমাকে সত্যি সত্যিই অন্তর থেকে তালাক দিয়েছ ! আমি যে তোমার হই নি, কখনো হব না, কথাটা এত সত্য, জানা ছিল না। আমি হামিদুলের। হামিদুলের কাছেই ফিরে যাব। কিন্তু যদি না ফিরতে চাই, তুমি কি করবে ?

বললাম, এখনো একটি তালাক বাকি আছে, সেটা দেব।

কথাটা বলতে গিয়ে এমনভাবে কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল ! রাবেয়া বল-কাঁটা ফেলে দিয়ে খাটে উঠে এসে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ বুকের উপর মাথা রেখে আমার বুকের প্রত্যেকটি স্পন্দন শুনতে লাগল। বাইরে নিমগাছ বাতাসে দুলছিল। তার চিরল ফাঁকে চাঁদের ঝিলিমিলি। আরো রাতে পাশের ঘরে, রাবেয়ার ঘরে, রাবেয়ার আর্তচিৎকার শোনা গেল। ধসমসিয়ে উঠে ছুটে এলাম। দরজা বন্ধ। খিল তোলা ছিল না। আলো জ্বেলে দিলাম সুইচ অন করে দিয়ে। রাবেয়া বসে আছে বিছানায়। ফুলে ফুলে কাঁদছে। চোখে আতঙ্ক।

—কি হয়েছে রাবেয়া ?

—বাইরে কেউ এসেছিল, মামুন। জানলায় টোকা দিচ্ছিল।

—কে, এসেছিল ?

—জানি না।

বুঝলাম, রাবেয়া স্বপ্নে-ভয় পেয়েছে। এক গেলাস জল গড়িয়ে দিলাম কলসী থেকে। ঢকঢক করে জল খেল। সমস্ত শরীরে যাতনার স্পষ্ট লক্ষণ। কে যেন তার শরীরের উপর অত্যাচার করে গেছে।

সাত

পরেব দিন কলেজে এসে মনে হলো. বাড়ি ফিরে যাই। ভাবছি, এমন সময় পিয়নটা এসে খবর দিলে, একজন মহিলা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে চায়। প্রফেসর রুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, রাবেয়া দাঁড়িয়ে।

—চলে এসেছি। থাকতে পারলাম না।

—বেশ করেছ। চলো। ওহো, দাঁড়াও ; প্রিন্সিপালকে বলে আসি একটু।

—কী বলবে ?

—কী বলব ? বলব, আমার মিসেস এসেছেন। ওঁকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। গেটের বাইরে এসে রিকশা ডেকে দু জনে উঠে বসলাম। রাবেয়া বললে, একলা খুব ভয় করতে লাগল।

—স্বাভাবিক।

—দিব্যি কেমন চমকে দিয়েছি !

—একটু আগেই ভাবছিলাম, বাড়ি ফিরে যাই। জানো, অনেক ভেবে দেখলাম, এ ক-টা দিন, তোমার কথাই ঠিক, আমাদের ভালো থাকতে হবে।

—এ কয়দিন ছুটি নাও।

—তবে এক সপ্তাহ ছুটিই নেব।

—কোথায় যাবে এখন ?

—যেদিকে দু চোখ যায়।

—আমাকে নিয়ে পালাতে পার না ?

—কোথায় ?

—যেদিকে দু চোখ যায় !

দু জনেই হেসে উঠলাম। শুধালাম, কী খাবে বল ?

—খাওয়া-দাওয়া এখন থাক্। চলো, কোথাও ফাঁকে মাঠে বসব। কলেজের ছেলে-মেয়েদের মতো। বকবকম করব। অজস্র অর্থহীন কথা হবে আমাদেব।

—ঠিক বলেছ ! আমরা কিছু না পারি প্রেম করতে তো পারি ! এই রিকশা দাঁড়াও।

রিকশা থেমে গেল। নেমেই বললাম, ব্রিজের ওপারে ফাঁকা রাস্তা। খানিক গেলে কানা একটা স্টেশন। লোকজন থাকে না।

রাবেয়া বললে, মুন্নার ছবিটা কোথায়, পাচ্ছি না। তুমি নিয়েছ ?

—নিয়েছি।

—কী করবে ?

—দেয়ালে টাঙিয়ে রাখব। এনলার্জ হচ্ছে।

কিছুক্ষণ আমার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকল রাবেয়া। হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজ পার হলাম।

—ওটা কী পাখি মামুন ? এ সব প্রেমে দু-একটা উড়ন্ত পাখি লাগে, জানো ?

বললাম, খানিকটা নীল আকাশ আর হালকা মেঘ লাগে। ফুল লাগে কিছু।

—ফেরার পথে কিনে নেব।

চারি দিকে গাছপালা। ঘনছায়া। পাখি। নির্জনতা। বসলাম। এ দিকে বাস চলে খুব কম। লরি চলে। এ দিগন্ত প্রেমের। এ অবসর ভালোবাসার। সমস্ত দুঃখকে ভুলে পেছনে ফেলে আসার। রাবেয়া আচম্বিতে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ফেললে। তার পর কিছুক্ষণ ঘাড়ে মাথা রেখে নিঃসাড় পড়ে থাকল। তার পর একটি ইনল্যান্ড খোলা খাম সামনে মেলে ধরল।

প্রিয় মামুন,

সাতাশ তারিখ আসছি। তুমি যদি রাবেয়াকে আমার হাতে তুলে দাও,

নতজানু হয়ে গ্রহণ করব। না দিলে ফিরে আসব। আমার সাথে কেউ যাবে না তুমি ভালো থেক। আমি এ চিঠি জেলার বাইরে থেকে লিখছি। এতদূরে এসে মনে পড়ছে, আমরা দু জনই একদিন রাবেয়াকে ভালোবেসেছিলাম। আজও তেমনিই ভালোবাসি। ইতি তোমার হতভাগ্য বন্ধু

হামিদুল।

রাবেয়া বললে, চলো উঠি।

বললাম, চলো!

কিন্তু এখান থেকে উঠে কোথায় যাব? কেনই বা উঠে যাব? রাবেয়া কেন উঠে যেতে চায়? হঠাৎ তার কি এমন হলো, যাতে সে উঠে যেতে চাইছে? হামিদুলের চিঠিটা পিয়ন দিয়েছে যখন, তার পরই রাবেয়া আমার কলেজে চলে এসেছে, বাড়িতে টিকতে পারেনি। তার ভয় করেছে। আমাকে দেখতে ইচ্ছে করেছে। আমাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছে। এই একটি ক্ষুদ্র চিঠির ক্ষমতা অনেক। শমনের মতো পাওয়ারফুল। কিংবা এ হঠাৎ নতুন হয়ে ওঠা ভালোবাসার মতো শৌখিন। স্বাদু এবং বর্ণময়। এ যেন পুরাতন রাস্তার অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে ডেকে ওঠা চির-চেনা বন্ধুত্ব। সমস্ত হৃদয়াবেগকে এ চিঠি মুহূর্তে স্তব্ধ অনড় লীলায়িত তরঙ্গের মতো চিত্রার্পিত করে দেয়। সমস্ত স্পর্ধাকে রুখে দিয়ে বলে, আমি আসছি। আমি এসে গেছি।

অথচ কী আশ্চর্য! আমাদের অতৃপ্ত, ভয়ে-ঠাসা, নম্র-শঙ্কিত, অশ্রুজলে মাখামাখি যেন বা সামান্য দৈব অর্পিত ভালোবাসার পায়ে নতজানু হয়ে আছে। ভিখারীর মতো এ চিঠি করুণায় উজ্জ্বল, বিরহ-নিষিক্ত একটি ক্ষুধার্ত ভালোবাসার অশ্রুপাত। এর ক্ষমতা অনেক। অথবা এ তুচ্ছ। ঘাস ফুল। এ কিছু নয়। কোনো কিছুই নয়। 'চলো!' বলে উঠতে গিয়ে বাধা পাই। রাবেয়া আবার তার বুকের উষ্ণ আবেগে টান দেয়, আলিঙ্গনে তপ্ত প্রখর হতে চায়। বাধা দিয়ে বলি, না! লক্ষ্মী মেয়ে! না!

রাবেয়া আরক্ত ঠোঁটে ঘন নিশ্বাসে অবাধ্যের মতো আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। আমি এক রকম জোর করে টেনে তুলি ওকে। টেনে নিয়ে পার হই ব্রিজ। ও যেন এলোমেলো আহ্লাদে আমার পাশে হেঁটে চলতে চলতে কেমন ঢলে গলে পড়তে চায়। এভাবে হাঁটা ঠিক হচ্ছে না, বুঝতে পারি। তাই রিকশা পেতেই উঠে পড়ি রিকশায়। এসে নামি ফুলের দোকানে। ফুল কিনি। রাবেয়াকে তার ইচ্ছে মতো ফুল কিনবার অধিকারে সুখী করি। একটি রঙিন

কাগজের প্যাকেটে নানারকম সুগন্ধি গোলাপ কেনা হয়। সাদা কিছু ফুলও কিনে ফেলে রাবেয়া।

বলি, এত ফুল কি হবে? সবই তো শুকিয়ে যাবে।

—তা যাক। তা বলে কিনব না?

—কেনো। কেনো। যত খুশি কেনো।

—একটু আতর আর গুলাবপানি কিনতে হবে।

—কেন?

—আতর তোমার ভালো লাগে না?

—লাগে।

—গুলাবপানির শরবত?

—লাগে।

আর কি লাগবে যেন? এই যা, ধূপবাতি?

আতরের দোকানে আতর। ধূপবাতির দোকানে ধূপবাতি।

সব কেনা হয়। সুর্মা কেনে এক শিশি। তার পর বাবেয়া বলে, আব কি বাকি রইল?

আরো কি সব টুকিটাকি কেনে সে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কেনাকাটার বহর দেখে যাই। পথে নেমে রাবেয়া বলে, এইটুকু হেঁটে যাব।

আমি বলি, এইটুকু কোথায়? ঢের পথ। যেতে যেতে সূর্য ঢলে যাবে।

—তা যাক! তবু হাঁটব।

রাবেয়া ক্রমশ উচ্ছল হয়ে ওঠে। আজ এই মুহূর্তে তাকে ছেলেমানুষী খেয়ালে চালিত রূপসীদের মতো অবাক লাগে। সে যেন আমাকে নিয়ে দূরন্ত আবেগে কোথায় পালিয়ে হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চায়। জীবনের দুই মুখে মোমবাতি যেভাবে পোড়ে, এ যেন তাই। নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়ার নেশার মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে নিজের পরিধি। কোথাও পালানো যায় না, অথচ পালানোর মতো একটা মজা করে যাওয়া। কিচ্ছু না। স্রেফ একটা অলৌকিক তৃষ্ণা নিয়ে আপন অস্তিত্বকে বুঝতে চেষ্টা করা। এই বিপন্ন বিপর্যস্ত জীবনের দিকে যারা এবং যে ঘটনা, যে-সব অনিয়ম ঠেলে দিয়েছে আমাদের দু জনকে, তার প্রতি একটি ব্যাখ্যার অতীত আক্রোশ দানা বেঁধে উঠেছে। যেন দু জনের দুখানি হাত পেছনে মুড়ে মুচড়ে বেঁধে দুই চোখে পট্টি বেঁধে একটি জটিল বাঁকা পথের দুই বিপরীত প্রান্তে ছেড়ে দিয়ে বলা হয়েছে, দুজন দুজনকে খুঁজে নাও, স্পর্শ কর। এই খেলার নাম ইদ্দাৎ কিংবা তালাক-শাসিত দাম্পত্য। গর্হিত লুকোচুরি খানিক, খানিকটা আত্মপীড়নের সুখ দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে এই নাটক, এখন কেবল শূন্যে

দু হাত প্রসারিত করে ভুল লক্ষে স্পর্শ খুঁজে ফেরা। তাই এখন নিজেকে ক্রুদ্ধ করে তুলছে রাবেয়া। এ এক আশ্চর্য বেপরোয়া ক্রোধ নিজেরই মধ্যে দংশন করছে। নিজেকে রক্তাক্ত করে তুলতে এত বড় নিষ্ঠা কেউ কখনো ভাবতে পারে না।

বুকে ধরে রাখা একটি হালকা প্যাকেট আমাব দিকে এগিয়ে দিয়ে রাবেযা বললে, নাও। ফুলের প্যাকেটটা তুমি নাও। হাতটা প্রসারিত কবতেই চেয়ে দেখলাম এই প্রথম হাতের তালুতে মেহেদির নকশা। এতক্ষণ লক্ষ হয়নি কেন ভেবে আশ্চর্য হলাম। মেহেদির রঙে ছোপানো হাত পাতলা সুরভিতে কামার্ত দেখায়। জানতে চেয়ে বলি, আজ তোমার সবই কেন যেন ইয়ে মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার গো? কী উৎসব আজ? হাতে মেহেদি লাগিয়েছ কখন?

—তুমি কলেজে চলে আসার পর, ফুলমতিব এনে দেয়া বঙের নির্যাস, সাধ হলো! বেটে লাগিয়ে দিলাম। মনে পড়ে?

—কী?

—সেই যে সেবার তুমি হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করলে, রেজাল্টের দিন তোমার পড়ার ঘরে দেখা করতে এলাম, ভাবীর নতুন বেনারসী পরে, হাতে মেহেদি। অন্যমনস্ক হয়ে বললাম, হবে।

—হবে কি গো! দিব্যি সেই সব মনে পড়ছে আমার!

—কী সব?

—সেই যে তুমি হাতখানা হাতের মুঠোয় তুলে নিলে।

—তার পর?

—তালুতে মুখ নামিয়ে নিশ্বাসে গন্ধ টানলে। বললে, কী মিষ্টি।...মেহেদির গন্ধ সত্যি তোমার ভালো লাগে?

—কী জানি।

—এই! তুমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছ?

—মেহেদি বোধ হয় কোনো কিছুর প্রতীক।

—কিসের?

—জানি নে ঠিক। সানাইয়ের সুর আর মেহেদির ঘ্রাণ, কোথায় একটা মিল আছে।

—তুমি মস্ত কবি। হয়তো খানিক পাগলও বটে। এ-সবের কোনো মানে আছে?

—তুমি একটা মানে চাইছ বলে মনে হচ্ছে।

—তাই?

—হুঁ ! মেহেদি-রাঙানো হাতের স্বপ্ন কোন পুরুষ না দেখে যৌবনের দিনে !

—সে স্বপ্ন তোমার পূর্ণ হলো না।

—বলতে পার চিরদিনের মতো ভেঙে গেল

—কেন ? চিরদিন কেন ?

—আসলে এ ব্যাপারে আমার আব কোনো স্বপ্ন দেখাই চলে না।

—দুঃখ করো না মামুন ! আজ অন্তত সুখী হও।

—তাই হোক।

ফুলের প্যাকেট থেকে ফুলেব গন্ধ এসে নাকে লাগে। আমি চুপ করি। বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে চৌমাথায় একটি বিকশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে এসে রিকশায় উঠে পড়ে বললাম, কালীবাড়ির পার্কে গিয়ে বসব দু-দণ্ড। চলো। রাবেয়া কিছুটা ইতস্তত করে উঠল রিকশায়। পাশে বসে কোলের উপর প্যাকেট-ফ্যাকেটগুলো গুছিয়ে রাখলে। কপালের পাশে চোখের উপর চূর্ণ চুলের এলোমেলো ছড়িয়ে থাকা উদাসীনতা। কপালে রক্তাক্ত টিপ। হাতে মেহেদি, পায়ে গাঢ় রঙের আলতার ছোপ। বাসন্তী রঙের শাড়ি। সবই কেমন এক পরিপাটি ব্যাপার।

রাবেয়া সেজেগুজে কলেজে চলে এল। এভাবে কলেজে আসা তার কথা নয়। কোথায় এক অস্বাভাবিক দৌরাত্ম্যের ইচ্ছে ঝলকে উঠছে তার রূপে, মুখের উপর ভাসছে খুশি খুশি কুচি ঢেউ।

হঠাৎ রিকশা থেকে নামার সময় ঝনাৎ করে একটা শব্দ হলো। পার্কে বেঞ্চে বসার সময় আর একবার। রাবেয়ার আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা। সবই অদ্ভুত। সবই গেরস্তালীর চমক। ঠাট-বাটের নিখুঁত পালিশ লাগানো। ঘরণী যেন তার ঘরকে সঙ্গে এনেছে, যেখানে যাবে ঘর তার সঙ্গে যাবে।

বললাম, এতগুলো চাবি নিয়ে ঘুরছ ! কোথাও যদি পড়ে যায় ?

—পড়লেই হলো আর কি ! সব সময় শব্দ পাই। সব সময় মনে হয়, আমার ঘর আছে। স্বামী আছে। আমি ঘরণী। আমি গৃহিণী। আমার অনেক ব্যস্ততা, অনেক কাজ।

—বাঃ। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গোরু, এরকম একটা সংসারেই তো ছিলে তুমি, কিছুদিনের জন্য সে সংসার তোমার হারিয়ে গেছে। সেই সোনার সংসারকে আবার ফিরে পেতে ইদ্দাতের কঠিন তপস্যা করছ তুমি। তোমার তপস্যা নিষ্ফল হতে পারে ?

—তাই কি হয় নাকি ? কখনো না। আমার সংসার আমারই। আমার

সিংহাসন খালি পড়ে আছে।

কেবল দু দিনের জন্য অন্যের সংসারকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেখালে, দেখ, সংসার কত সুখের, এই তার সৌন্দর্য ! লোভ জাগিয়ে তুলে পালাবে এবার।

—যদি না যাই ! যদি থেকে যাই ! এই চাবিগাছা যদি চিরকাল আঁচলে বাঁধি ! তুমি তাড়িয়ে দেবে না তো মামুন ? চুপ করে থেকো না। উত্তর দাও।

বললাম, তুমি কেবল সাজাতে এসেছ। থাকতে আস নি। এ সংসার তোমার নয়। আমারও নয়। এ কোনো গার্হস্থ্যই নয়। এটা তার গল্প মাত্র। এ গল্প তুমি আমাকে, আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। গল্পের সংসার দেখে বাস্তবের সংসারকেও অনেক সময় চেনা যায়।

—যায় নাকি ? এ সংসার দেখে, তুমি বলতে পারো, হামিদুলের সংসার কেমন ছিল, ভবিষ্যতে কেমন হবে ?

—পারি না। বললাম একটু চুপ করে থেকে—সে সংসার তোমাদের, তোমরা যেমন করে সাজিয়ে তুলবে, তেমনিই হবে। আমি বলব সুখে থেকো। জীবনকে অপমান করো না।

—আশীর্বাদ করছ ?

—কামনা করছি।

—কেন ?

—তাই উচিত।

—কেবল উচিত বলে ? আর কিছু নয় ?

—আর কি ?

—আর কিছু নয় ? স্রেফ উচিতের পেছনে ছুটছ তুমি ?

—তোমার পেছনেও ছুটছি। আমিও শব্দ শুনি। ভালো লাগে। চাবির শব্দ। মেহেদির রঙ !

—তুমি বোকা ! বোকা ! বোকা ! স্রেফ বোকা ! বলতে বলতে রাবেয়া আমার কোলের পাশে থেকে কাত হয়ে মুখ গুঁজে মৃদুস্বরে ডুকরে কেঁদে উঠল। ওর পিঠে হাত রেখে ডাকলাম, রাবেয়া ! কেঁদো না ! কেঁদে কোনো লাভ নেই।

—তুমিই তো বার বার আমাকে কাঁদাচ্ছ। রাবেয়া একটু ফুঁসে উঠে মুখ তোলে। তার পর আবার মুখ গুঁজে দেয়।

এইভাবে বসে থাকতে থাকতে কান্না স্তিমিত হয়। হঠাৎ কেমন এক লোভ জাগে। বুঝতে পারছি, রাবেয়া গাজীপুর যেতে চায় না। আমি ওকে ত্যাগ করতে নাও পারি। ও চায় আমি ওকে ছিনিয়ে নিই। হামিদুল একদিন সুযোগ বুঝে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আজ আর এক সুযোগে আমি স্ন্যাচ করলাম। সে দখল করেছিল, আমি তাকে উচ্ছেদ করলাম। অন্যায় কোথায় ? হামিদুল আসবে।

শূন্য টাঙ্গা ফিরে যাবে।

রাবেয়া বলবে, আমি হামুর ভাত খাব না মামুন ! আমি তোমার ভাত খাব ! ঘটনা কি অস্বাভাবিক হবে ? হামিদুলের চোখের কোনা কি চিকচিক করে উঠবে ? বুকে ব্যথায় টান ধরবে ?

আমি বলব, রাবেয়া তো আমারও। তুই বলেছিস ! আমি তাকে নিলাম ! হামিদুল বলবে, তুই যে বলেছিস মামুন ! যে দুঃখ সইবার জো এবং যোগ্যতা আমার নেই, নিজের দোষে আমি সেই দুঃখকে বরাবর বহে এনেছি। আমি এ দুঃখ সইতে পারি, তুই বল ?

—কী ভাবছ গো ! রাবেয়া সহসা উঠে বসে প্রশ্ন করে।

আমি চমকে উঠে রাবেয়ার মুখের দিকে চেয়ে দেখি। কান্নার পাতলা করুণ ছায়ায় সন্ধ্যা নেমেছে ওর চোখে। এতক্ষণের সব সংঘাত থেকে আর একটি নতুনতর সংঘাতের আবেগে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছে।

বললাম, না। কিছু না। চলো ওঠা যাক।

—তাই বেশ। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে !

—এই সাঁঝবেলায় ?

—খুব ক্লান্ত লাগছে মামুন !

আমরা উঠে পড়ে রিকশা ধরলাম। আকাশে চাঁদ উঠল। পুবদিগন্তে একখণ্ড মেঘ উঁকি দিচ্ছে। আশ্বিন ফুরিয়ে আসছে। কেমন একটা ক্ষ্যাপা হাওয়া নামছে আকাশ থেকে। ঝড় উঠবে বোধ হয়। আঁধির বাদলার পূর্বাভাস পাচ্ছি। একটি ঘনঘোর বাদলার রাতে রাবেয়া এসেছিল। রাবেয়া চলে যাবে। এক সপ্তাহ বাদে আমি একলা থাকব আমার এই শহুরে বাসবাড়িতে। তার আগে আঁধির প্রলয়ে ছেয়ে যাবে প্রকৃতি আর মানুষ। আচ্ছন্ন এই জগতের বুকে আমি আঁধির আকাশে শুনতে পাব আমারই বুকের তীক্ষ্ণ তীব্র বোবা আর্তনাদ। ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণীর উল্লাসে এক নিরাকুল আবর্তে তোলপাড় করবে দিশাহীন একটি প্রেম। যে প্রেমের বৈধতা অবৈধতার কোনো সীমারেখা আমি নিরূপণ করতে পারিনি।

সন্ধ্যার পর। মেঘ ডেকে উঠল। মাতাল হাওয়া লেগে দরজার শেকল নাড়া খেল। ঘর অন্ধকার করে বিদ্যুৎ চলে গেল। মোমালোকে সাজিয়ে তোলা হলো রাত্রির আঁধিবেষ্টিত গৃহখানি। প্রকৃতি রোষে ফুলে ফেঁপে আছাড় খাচ্ছে নিয়ত। কী সব ভাঙছে। টানা বিহ্বল গোঙানিতে উচ্চকিত করছে তাবৎ বিশ্ব। রাবেয়ার চোখে সুর্মা। পরনে রূপ ঠিকরে তোলা পোশাক। খাওয়া দাওয়া হোটেলে সাঙ্গ করে এসেছি। রাবেয়ার হাতে পান। রাবেয়া এগিয়ে এল। বিছানায় ছড়ানো

ফুলের ছড়াছড়ি। আতর সুরভিত বালিশ চাদর। ধূপবাতির সুগন্ধি ফোয়ারা। টেবিলে গুলাবপানির শরবৎ আর দুধ। এ-সব কিসের প্রস্তুতি?

রাবেয়া বললে হাসতে হাসতে, আজ আমাদের ফুলশয্যার রাত। রেডিওতে আজ এক ঘণ্টার রবীন্দ্রসংগীতের আসর। যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।

রাবেয়ার চোখে ভয়ংকর সর্বনাশ তমসার পেছনে সলতের মতো পুড়ছে। দুলছে। ধিক্‌ধিক্ করছে তার ক্রুর নিস্তব্ধতা। চোখের পেছনে নড়াচড়া করছে কেঁপে কেঁপে ওঠা কিসের দুর্বোধ্য আকৃতি! এই আগুন কামনার জিভ বার করে চেয়ে আছে।

রাবেয়া আরো এগিয়ে এল। বিছানায় বসে ছিলাম আমি। ভয় পেয়ে বালিশে মাথা রেখে আধশোয়া হয়ে মুখ গুঁজলাম। রাবেয়া বিছানায় বসল চেপে। গায়ে হাত রেখে বললে, নাও। পান খাও।

—আমি পান খাই না।

—ভালো পান। খাবে না কেন?

—পান খেয়ে কী হবে?

—খাও। তার পর বলছি। ইস্! এত দেরি করে?

তাড়াতাড়ি পান নিয়ে মুখে পুরলাম। রাবেয়া বললে, বাসর রাতে বউ যা বলে, শুনতে হয়।

—আজ বাসর রাত হতে যাবে কেন? এসব কী খেয়াল হয়েছে তোমার?

—ইদ্দাতে একটি সার্থক সুন্দর বাসর রাত্রি প্রয়োজন। দুটি তালাক দিতে এবং একটি তালাক হাতে রাখতে যার ভুল হয় না, তার বাসর রাতের কথা ভুল হয় কেন?

—তুমি, রাবেয়া হাসালে দেখছি! ঐ সব তালাক-টালাক বিশ্বাস কর তুমি?

—করি।

—কর?

—নিশ্চয় করি। নইলে এই তিন মাস কি বেশ্যার মতো 'জিনা' করব বলে বসে আছি? আছি যখন, আছি কোন্ সাহসে? তুমিও বিশ্বাস কর বৈকি! লোকদেখানো বিশ্বাস করতেই হয়। ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামি করো না মামুন, আমি তোমার হাদিস কুরানের বউ।

—আমায় মাফ কর রাবেয়া। তুমি আমার কেউ না। কিচ্ছু না।

—তাই বুঝি! রাবেয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকে আসে। চোখে চোখ রেখে কঠিন করে চেয়ে থাকে। বলে, আর মাত্র সাত দিন। চলে যাব। চলে যাব,

বিশ্বাস হয় ? কষ্ট হয় না ?

বললাম, সে কথা কি মুখ ফুটে বলতে হবে ?

—আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে মামুন ? অ্যাদ্দিন তোমার ঘর করলাম। কতরকম স্বপ্ন দেখলাম। চলে যাব। কখনো আর আসব না। এই মুখপুড়ি কখনো আর জ্বালাতন করবে না ! শুধু একটি স্বপ্নকে বুকে করে ফিরে যাব। বলব, এ কোনো বাস্তব বিষয় নয়। স্রেফ একটি স্বপ্নের ঘটনা। দাও আমাকে।

—কী চাও তুমি ?

—একটা কোনো চিহ্ন।

—অভিজ্ঞান ?

—হ্যাঁ, অভিজ্ঞান ! স্বপ্ন দিয়ে মোড়া। স্মৃতিচিহ্ন। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যেমন দিয়েছিল।

—তেমন কিছু তো নেই আমার। কী দেব তোমাকে ? তা ছাড়া অভিজ্ঞান কী হবে ? শকুন্তলার দরকার ছিল। পুনর্মিলনের জন্য জরুরি ছিল। চির-বিচ্ছেদের জন্য কোনো চিহ্ন তো দরকার করে না।

রাবেয়া বললে, বিচ্ছেদ কে চায় বল ? আমি দূরে চলে যাব, কিন্তু আমৃত্যু তোমার অভিজ্ঞান বুকে করে রাখব। সেই আমার চির-মিলনের সাধ। দাও না ? কোল আলো করে থাকবে।

—কোল আলো করে থাকবে ? আমি চমকে উঠি।

—হ্যাঁ গো। কোল আলো করে, যেমন করে মুন্না একদিন ছিল। তেমনি একটা বাচ্চা দাও আমাকে। তোমার আমার রক্তমাংসে গড়া স্মৃতির পুত্তলি। ড্রিম-চাইল্ড। খোয়াবের পোলাপানে কার না লোভ ! বিনোদপুরের মেলার মতো অজস্র নয়। একটি মাত্র কণা ! জীবন্ত প্রাণবন্ত অভিজ্ঞান ! তুমি দুষ্মন্তর মতোই রাজা। আমি হতভাগিনী ঋষি-কন্যা। তুমি প্রফেসর ! আমি অর্ধশিক্ষিত মুসলমান নারী ! তবু এরা অসম্ভব স্বপ্নে একদিন মিলিত হয়েছিল। তার প্রমাণ দাও। কোনো পাপ হবে না মামুন ! মাতৃত্বের কামনাকে তুমি আঘাত করো না। এই ?

আমি চোখ টেনে নিই—। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অস্ফুটে বলি, না !

—কেন নয়, প্রফেসর ? মুন্না বার বার স্বপ্নে আসে। হাত ধরে টানে। কোথায় টানে, কেন টানে, তুমিই বল ?

—আপন সংসারে হামিদুলের কাছে ফিরে যাবার জন্যে টানে।

—কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—সুখের সংসার চায় স্বপ্নের শিশু।

—অ্যালবামে তোমার ছবির পাশে মুন্নার ছবি আটকে রেখেছে হামিদুল। রোজ খোকাকে বলত, প্রফেসরের মতো বিদ্বান হ বাবা ?

—আপন সন্তান বড় হোক কে না চায় ?

—তুমি চাও না ?

রেগে উঠে বলি, এ-সব কি বলছ তুমি রাবেয়া ? তুমি পাগল হয়ে গেছ !

রাবেয়া বলে, তবে কি তুমি পাপের ভয় করছ ?

—তাই যদি মনে কর, তবে তাই !

—ভণ্ড তুমি ! পাপ-পুণ্যে পরলোকে বেহেস্ত দোজাখে এই বললে বিশ্বাস কর না।

—এখন করি। এই মুহূর্তে করি।

—তবে তাই হোক। পাপ ভয়। পুণ্যের কামনা।

—হ্যাঁ তাই !

—ইদ্দাৎ ?

—হ্যাঁ। ঠিক তাই। পাগলের মতো বলে ফেলি। বোকার মতো।

—তবে সে পাপ পুণ্য ধর্মের বচন। সেই ধর্মমতেই আমি তোমার সহধর্মিনী। আমি স্বপ্নের শিশুকে ভালোবাসি। তুমি সেই মাতৃত্বকে অপমান করতে পার না। লক্ষ্মী সোনা, আগে ভালো করে বোঝ ব্যাপারটা। আমি সোজা হামিদুলের কাছে ফিরে যাব। আরো তিন মাস দশ দিনের ইদ্দাৎ দরকার করবে না। এই তিন মাসেই সব কিছু লালন-পালন হয়ে যাচ্ছে। শরীফ সাহেব এই বলে আশ্বাস দিয়েছে। এবার ভাবো ! কেউ জানবে না মামুন ! কেউ না। আমি কখনও ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেব না, স্বপ্নের শিশু কোথায় পেয়েছি।

—না। এ হয় না।

—দেবে না ?

না গো না। এটা অনুচিত।

মনে হলো, রাবেয়া ক্রমশ লুব্ধ এবং তপ্ত হয়ে উঠছে। আমি যেন তাকে তার ন্যায্য পাওনা ইচ্ছে করেই দিচ্ছি না, এ যেন মস্ত কৃপণতা।

গম্ভীর হয়ে বললাম, তুমি একটু সরে বস রাবেয়া !

—কী !

ধ্বক করে জ্বলে উঠল রাবেয়ার চোখ। তমসার পেছনের নগ্ন আগুন। আমি সরে যাব ? কেন, কী হয়েছে ? এত ঘেন্না কিসের ? তুমি কি ভাব শুনি ? ভাব, এই ভাবেই সংসারকে তুষ্ট করবে, তাই না ? কিন্তু জেনে রেখো, সংসার তোমায় বিশ্বাস করে না। হামিদুলও আমায় চিরকাল সন্দেহ করবে। তুমি ওকে চেন

না। তোমার চরিত্রের পবিত্রতা একটা ঠুনকো সেন্টিমেন্ট। মানুষের কাছে তার কোনোই দাম নেই।

বললাম, না থাক। কেউ না বিশ্বাস করুক। তবু আমি আমার বুদ্ধি জ্ঞান মনুষ্যত্ব বিবেকের কাছে দায়ী হতে পারব না।

—কেন তবে তুমি আমায় বিয়ে করলে, বিয়ের সময় তোমার বিবেক কি লোভমুক্ত ছিল ? আমাকে তুমি সাত দিন বাদে ফিরিয়ে দেবে, তখন আমার কী হবে ? হামিদুল বিশ্বাস করবে না। ফের সে আমায় তালাক দেবে, তখন কী হবে, বল ?

বললাম, তা সে দেবে না।

—দেবে না তার গ্যারান্টি কোথায় ?

বললাম, আমি কি তার গ্যারান্টি দিতে পারি ? সে গ্যারান্টি ইহলোকে নেই। কুরানে হাদিসে সে গ্যারান্টি নেই। আমি দেব কোত্থেকে ?

—ও ! আর এদিকে তোমার নিজেরও কোনো ভয়ডর নেই। চিতির কুলে দাঁড়িয়ে শুধিয়েছিলাম, বুকে হাত দিয়ে বল, ভয় করে না ? সেই একই প্রশ্ন আবার করি, সত্যিই কি তোমার ভয় করে না, মামুন ?

—না।

—মানুষ তোমাকে ঘৃণা করবে। কামুক এবং লম্পট ভাববে। ভাববে গাঁয়ের একটা সরল মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি-ফাত্তা মেরেছ। তুমি প্রফেসর। ভয় করে না, তোমার ?

—না, করে না।

—তবে তুমি কী একটা ? কী তুমি ? পাথর নও ?

—হ্যাঁ। পাথর।

—ভেবেছিলাম, সেই দুর্যোগের রাতে তুমি আমাদের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে।

—পারি নি।

—আসলে তোমার চরিত্রে, সে শক্তিই ছিল না।

বললাম, তুমি পাগল হয়ে গেছ রাবেয়া। তুমি পাগল হয়ে গেছ। তুমি থামো। তুমি চুপ কর।

—চুপ করব ? কেন চুপ করব ? বল ? কেন ?

রাবেয়া এবার আমার মুখের উপর তার পাথরের মতো ঠাণ্ডা ঠোঁট চেপে ধরল। তার পর বুকের উপর মাথা রেখে ককিয়ে উঠল কান্নার আবেগে। তার

পর কাঁদতে কাঁদতে আমার বুকে কিল ঘুষি ছুঁড়ল। তার পর বুকের উপর মাথা ঠুকতে ঠুকতে শান্ত হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। হঠাৎ খেয়াল হলো, রাবেয়ার চোখ বন্ধ, রাবেয়া ঢুলছে। ওকে ধরতে গেলাম। সে অজ্ঞান হয়ে বিছানায় গড়িয়ে গেল। আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে যেন বা নিঃশব্দ নিস্পন্দ হয়ে গেছে। ঠিক এসময় কানের কাছে খতিবের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেলাম, হামিদুলের পয়সায় তুমি মানুষ হয়েছ। তোমার বাচ্চাও কি মানুষ হবে ? কাগের বাসায় বগের ডিম ! কিন্তু তুমি নেমকহারাম নও।

রাবেয়াকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় পাশের ঘরে শুইয়ে দিলাম। রাত্রি বাড়ার সাথে সাথে তার গায়ে মৃদু জ্বর দেখা দিল। আকাশ যেন ভেঙে পড়তে লাগল। জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে ঘোর বাদলার এই আকাশের কালিমালিপ্ত নিশীথে রাবেয়া চমকে চমকে উঠল। মাঝে মাঝে চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। ঘরের মধ্যে কাকে যেন খুঁজতে লাগল ! আমি এগিয়ে গিয়ে চোখের সামনে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে চোখ বুজে ফেলল। শেষ রাত্রি অবধি সে জ্বর আর কমল না। দিনের বেলা ডাক্তার ডেকে আনলাম। সকালের দিকে বৃষ্টির দাপানী কিছু কমে এলেও, বিকালের দিকে আকাশ বার্নিশ করা মেঘে থমথম করতে লাগল। হাওয়া উঠল।

ডাক্তার বললে, স্নায়বিক উত্তেজনা। সব সময় পাশে থাকবেন। রোগী প্রলাপ বকতে পারে।

তাই হলো, পরের দিন রাত্রে জ্বর আরো বাড়ল। আশ্বিনের আঁধি আরো পরিব্যাপ্ত হয়ে অবিশ্রান্ত ঝড় আর বর্ষণে পৃথিবীকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল। হু হু বাতাসে কত কী মনে পড়তে লাগল। রাবেয়া প্রলাপ বকে চলেছে : আসছি খোকা দাঁড়া ! খোকাবাবু যায় লাল জুতুয়া পায়। তার পরই, দেবে না আমায় ? দাও ?

এবং তার পর পাগলের মতো হেসে ওঠে। আমি বিছানার পাশে বসে থাকি। ফুলমতি বলে, এই বাদলে পানিতে বিষ থাকে সাহেব। জ্বর-জ্বালা পাঁচ রকম অসুখ-বিসুখ হয়ই। এট্টু ভালো মুতন ওষুধপথ্যি কল্লেই সেরে যাবে বুবুমনি। এই ক দিনেই সুরৎ দেখেচেন, মিশির মুতন পুড়ে গেইচে, কালো হয়ে গেইচে। চেয়ে দেখতে দেখতে কখন আমার দুই চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। রোগীর মাথায় জলপট্টি দিয়ে বসে থাকি। তেতো বড়ি খেতে দিই। রাত্রি জেগে শিশি থেকে দাগ মেপে ওষুধ দিই। একদিন আচ্ছন্ন অবস্থায় রাবেয়া বলে ওঠে, টাঙ্গা

এসেছে ? আমি টাঙ্গায় চড়ব ! ডুলি বিবিরা আমার মুখ দেখবে। এক লাখ চব্বিশ হাজার পীরপয়গম্বর আমার বিয়ের সাক্ষী দেবে। আল্লার ১০১টি নাম, খতিব সাহেব, তছবীতে গুনে গুনে আমার হাতে দোয়া, তাবিজ বেঁধে দেবে। আমাকে জিন-পরী কেউ ছোঁবে না। পাপও না। পুণ্যও না। মুন্নার হাত ধরে আমি পুলসে রাত পার হব। বেহেস্তের দরজা খুলে/ডাকবে নবী উম্মৎ বলে/যে উম্মৎ সে যাবে চলে, ইয়া আল্লা, রছুল আল্লা !

আমি রাবেয়ার মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে দেখি। দুই চোখ বার বার ঝাপসা হয়ে আসে।...

অবুঝ মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা একটি মাত্র রাত্রির কামনা দিয়ে নিজেকে পরিতুষ্ট করতে পারে কি পারে না, তা যে কতখানি অনিশ্চিত, রাবেয়া এই বাস্তব ব্যাপারটা তার অবুঝ আকাঙ্ক্ষার কারণেই হয়তো বা বুঝতে চায়নি। তার কামনা যেমন বিমূঢ়, তার মাতৃত্বের সাধও তেমনি দিশেহারা। রাবেয়াকে শুধাবার ছিল, একটি অসম্ভব স্বপ্নে মিলিত হওয়ার জন্য তোমারই আপন ভালোবাসার কাছে আপনাকে এত খাটো করলে কেন ? এ কথা তাকে কখনও জিজ্ঞাসা করার অবকাশ পাই নি। ধীরে ধীরে ওষুধপথ্যি করে সে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। সাতটি দিন চোখের সামনে ফুরিয়ে এসেছিল।

আট

২৭ তারিখ ভোরবেলা আকাশ পরিষ্কার। মেঘ কেটে গিয়ে শরৎ বিদায় নিচ্ছে। সূর্যে ধোয়া সজল প্রকৃতি গ্রামের শান্ত রূপসীর মতো স্থির, ছবির মতো তন্ময়। আজ হামিদুল আসবে। কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করি। আসবে হামিদুল। আয় হামিদুল, নিয়ে যা। তোর বিশ্বাস, তোর ভালোবাসা আমি আগলে বুকে করে রেখেছি, তুই এসে নিয়ে যা। যেমন করে ধরে রাখতে বলে গেছিস, আমি তেমনি করেই ধরে আছি। তুই কতক্ষণে ফিরে আসবি, তারই অপেক্ষায় আমি অধীর হয়ে রয়েছি। তুই এলেই দেখবি, আমার চোখে মুখে শান্ত নির্লিপ্ত প্রতীক্ষা। ভালো করে চেয়ে দেখ, চোখে কোথাও দুঃখ কষ্ট আছে কিনা, তুই সবই যখন ফিরিয়ে নিবি, আমি বোকার মতো ব্যথিত হই কিনা, আমার ব্যথায় লোভ এসে জড়ো হয় কিনা ? আমিও তো তোরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ। ভালো আমিও বেসেছি। আমারও কিছু অংশভাগ রয়েছে তোদের ভালোবাসার ভেতর। এইটুকু তোকে আর একবার মনে রাখতে বলি। তোদের

ভালোবাসার দাম্পত্যে আমার ভালোবাসা চিরজীবী হবে, প্রতিদিনের চলাচলে আমি একটি ভাঙা-কলির গানের সুরে উঁকি দেব। তোদের সংলাপের ভেতর অতর্কিতে ঢুকে গিয়ে জ্বালাতন করব। দুঃখ দেব। বিশ্বাস দেব। অবিশ্বাস হানব। মাফ কর হামিদুল, আমি অবিশ্বাসের কোনো কাজ করিনি, তবু কেন অবিশ্বাস এসে তোদের সুখের জীবনকে বিপন্ন করবে, জ্বালাপোড়ার ব্যথা দেবে? এইটুকু কথা দে। তুষের আস্তরণে আমার ভালোবাসা এক টুকরো আগুনের মতো তোদের ধিকিধিকি জ্বালিয়ে দেবে না? আমি যেন বইয়ের পাতার ভাঁজে গোলাপের শুখা পাপড়ির মতো সুদূর-ছোঁয়া হালকা ঘ্রাণ হয়ে তোদের ভালোবাসায় মিশে যাই, আমি যেন তুষের সাঁজালো তীব্র অগ্নিকণা না হই!

তখন পৃথিবীতে ঢের রোদের ছড়াছড়ি। ভোর আটটা। স্নান করল রাবেয়া আমায় স্নান করালো। আপন হাতে রান্না করে হাতপাখার বাতাস দিতে দিতে খাওয়ালো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাবেয়া সোয়েটারটা এখনও শেষ করতে পারেনি। এমন সময় বাইরে টাঙ্গা এসে লাগল।

হামিদুল এসেছে।

রাবেয়া একটানে খুলে ফেলল সোয়েটার। কতকগুলো ঘর একদম ভুল হয়েছে। ফলে এমনই টান দিল যে তা জট পাকিয়ে গেল।

সোয়েটারটা যে ঠিক কোথা থেকে শুরুহয়েছিল, তার মুখ-মোখড়া আর স্থির থাকল না।

পর পর দেখলাম সেই বোরকা-পরা কুহেলিময় নারী। অতৃপ্ত কালো একটি ভালোবাসার মূর্তি। রাবেয়াকে বোরকা-পরা অবস্থায় চেয়ে দেখে ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠলাম। সুটকেশ হাতে ভয়ার্ত বোরকা-ঢাকা রূপসী রাবেয়াকে মনে হলো, আমার ভালোবাসা একটি অন্ধকারে ঢুকে গিয়ে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। আলো নেই, আছে ঘোর অন্ধকারে প্রস্তরীভূত স্তব্ধতা. নিরেট আহত, দলিত ভাস্কর্য, আমি যেখানে চোখের আলো ফেলে খুঁজছি, পাগলের মতো খুঁজছি। কী খুঁজছি আমি?

একটি শেকলের ছড়াচ্ছড় শব্দ হয়। একটি করুণ নারীকণ্ঠের নিষ্পেষিত আর্ত আকৃতি, কান্নার ধূমল অবরুদ্ধতা, অস্পষ্ট হাহাকার!

কী খুঁজছি আমি?

আমার চোখের সামনে হামিদুল দাঁড়িয়ে। বাইরে টাঙ্গা। সময় প্রস্তুত। এবার ওরা যাবে। আমি খুঁজব।

এই অতৃপ্ত অনুসন্ধান কেউ টের পাবে না। কাল হয়তো চন্দন সোম আসবে। এসে বসবে আমার ঘরে প্রস্তুত চেয়ারে। কথা হবে। অনেক কথা।

কিংবা হয়তো কোনো কথাই হবে না। কেবল সে শুধাবে, রাবেয়া কোথায় ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলব, নেই !

—কোথায় গেছে ?

—গতকাল তার আপন সিংহাসনে পুনর্বার অভিষেক হয়েছে, রাণীর মতো।

—কি সব হেঁয়ালী করছ, মামুন ! আমি রাবেয়ার সাথে কথা বলতে এসেছি, কনগ্র্যাচুলেশন দেব না ?

—কাকে দেবে, সে তো নেই !

—কেন নেই ?

—ওকে তালাক দিয়েছি।

—সে কি !

চন্দন দেয়ালের এনলার্জ করা মুন্নার ছবির দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে।

আমি তখন একটি বোরকা-পরা মহিলার অতৃপ্ত প্রেমের কাহিনী শুরু করব। আহত দলিত একটি ভাস্কর্য অন্ধকার পাষাণে খোদিত হবে। শৃঙ্খলের ছড়াচ্ছড় শব্দ হবে। দারুণ আর্তনাদ শোনা যাবে, তৃষিত ক্ষুধিত একটি প্রেম উচ্চকিত হয়ে পৃথিবীর বাতাসে ভেসে যাবে।

আমার কাহিনী শেষ হবে। আমার কথকতা ফুরিয়ে যাবে হে মৌলভী মৌলানা সাহেবগণ !

রাবেয়া, বোরকা-পরা বাদল রাতের মহিলা। আমায় টাঙ্গায় ওঠার আগে পায়ে হাত ছুঁয়ে নিচু হয়ে কদমবুলি (প্রণাম) করল। বললে, শেষ তালাকটি দাও এবার।

বললাম, ওটা থাক। ঐ একটি বাঁধন চিরকাল মুসলিম জাহানের কাছে অজ্ঞাত অশ্রুত থাক রাবেয়া। তুমি আর আমি জানব। আমি তোমায় ত্যাগ করতে পারি নি। মুখের কথায়, একটি শব্দে এই সম্পর্ক মিথ্যা হয় না।

রাবেয়া বললে, তাই হোক।

তার পর বললে, যাবার আগে মনে মনে আবৃত্তি করি, তুমি সুন্দর। তুমি পবিত্র। মানুষ তোমাকে ভুলতে পারে না।

চিতির দিগন্তে দ্রুতগামী, গাজীপুর অভিমুখী একটি টাঙ্গা জানলা থেকে

দেখতে পাই। মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ চোখের আড়ালে বিন্দুর মতো চলে যাচ্ছে।...

হ্যাঁ, মৌলানা সাহেব, হাফ ও ফুল মৌলভী সাহেব ! আমি এবং রাবেয়া দুজনই চেষ্টা করেছিলাম বিস্তর। আপ্রাণ এবং আন্তরিক। পারি নি।

হে অমর হাদিস, বিশ্ব-কুরান !

তোমার অমোঘ নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে পারি নি।

শরীফ সাহেব ! হজরত পীরজাদা কতুবুদ্দিন সাহেব। আমরা দুজনে ইদ্দাতের ষোলকলা পূর্ণ করতে পারি নি। ঢের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে গেছে।

আপনারাই ভালো বুঝবেন দোষঘাট কতটা। মাফ করবেন।

এ কাহিনীর স্রষ্টা তো আপনারাই। ধন্যবাদ, শুকরিয়া !

এই তিন মাসের দাম্পত্যজীবনের জন্য রাবেয়াকে পেয়েছিলাম। আপনারাই হাতে দিয়েছিলেন। রাবেয়াও আমাকে পেয়েছিল।

লক্ষবার শুকরিয়া। ধন্যবাদ।

আলহামদোলিল্লাহ্ ! শুকুর আলহামদোলিল্লাহ্ !

হে রাব্বুল আল্ আমিন।

এক টুকরো চিঠি

এক

আমার কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ভ্যানিটির মধ্যে এক টুকরো চিঠি আছে খুব মারাত্মক। আমার মা লিখেছেন তাঁর মাসির মেয়ে শিরিনকে। শিরিন আমার মায়ের সতীন ছিলেন। আমার বাবা প্রাক্তন মুসলিম লীগ এম· এল· এ·। শিরিন তাঁরই দ্বিতীয় পক্ষ ছিলেন। মাসি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো। আমাদের খুব বন্ধুত্ব ছিল। মা শিরিনমাসিকে স্নেহ করতেন। শিরিনমাসির পড়াশুনোয় যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর বাবার সাথে বিয়ে হয়েছিল। ওই অব্দিই পড়াশুনোর ইতি। শিরিনমাসি মায়ের চেয়ে সুন্দরী। বোধহয় আমিও তাঁর মত সুন্দরী নই। বাবা সেই রূপেই মুগ্ধ হয়ে শিরিনকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর পাঁচ বছর যেতে না যেতে বাবার সাথে মাসির বিচ্ছেদ হয়ে গেল। কেন যে বিচ্ছেদ হয়েছিল, সে-এক অতর্কিত বিস্ময়।

আমি তখন ক্লাশ নাইনের ছাত্রী। পুজোর ছুটির পর অ্যানুয়াল পরীক্ষা। রাত জেগে পড়াশুনা করতে হয়। শিরিন অঙ্কে এত ভালো ছিলেন যে মনে হত মহিলা যেন-বা অঙ্কের জাহাজ। উনি বলতেন, অঙ্কের জন্য মেধার খবরদারি লাগে না, চাই অভ্যাস। যদিও হায়ার ম্যাথমেটিক্স্ ইজ নট এভরিবডিজ কাপ অব টী। তথাপি প্র্যাকটিস চালিয়ে গেলে খোদাও ফেল করাতে পারে না। ইউ মাস্ট অবটেইন অ্যাট লীস্ট এইটি পারসেন্ট্ ইন এরিথমেটিকস। আই অ্যাম এ "শিওর সাকসেস" ইন ইওর হ্যানড। বাট আই অ্যাম নট ইওর টীচার। আই অ্যাম এ পুওর গার্ল, ফুল অব কনট্রাডিকশনস, মাই পয়েন্ট ইজ জিরো, রেজাল্ট ইজ জিরো, মাই আনসার ইজ নীল। এই ধারায় ইংরাজি বলা তাঁর অভ্যাস ছিল।

বলতে-বলতে শিরিন কেঁদে ফেলতেন। আমি কাঁচা অঙ্কের ছাত্রী, পরীক্ষায় সে বছর ৮২ নম্বর পেয়ে থার্ড হয়েছিলাম। আজ ইলেভেন ক্লাশে আর্টস-এর ছাত্রী উইমেনস কলেজে। আই অ্যাডমিট, আই নো, হায়ার ম্যাথমেটিক্স্ নট ইজ এভরিবডিজ কাপ অব টী। কিন্তু শিরিনের কাছে অঙ্ক ছিল এক গেলাস

মিছরির শরবত। হায়! অথচ শিরিনের বিদ্যের দৌড় কলেজ অব্দি পৌঁছতে পারেনি। আমার বাবাই ছিলেন তাঁর হায়ার ম্যাথমেটিকসের শেষ মাইলস্টোন, তার সংখ্যা ছিল জিরো। এবং মজাটা এই, অঙ্কের রাজত্বে জিরোরও নাকি একটা অদ্ভুত মানে আছে। শিরিনমাসি সেই স্টোন অতিক্রম করে কোথায় পৌঁছেছেন, আমি তার সামান্য জরিপ করেছি। বাকি রহস্য এই চিঠির আড়ালে লুকিয়ে। সেটাই এই গল্পের ভবিষ্যৎ। তার রেজাল্ট আমার জানা নেই। যাই হোক। মাসি বলতেন, তাঁর জীবনটা, তাঁর লাইফ, ফুল অব অ্যাডভারসিটিজ অ্যানড ফুল অব কনট্রাডিকশনস। একটা উলোটপালট আবর্ত। তখন সবখানি বোঝার সাধ্য ছিল না। ক্লাশ নাইনে পড়ি। বয়স মানুষকে কিছু অঙ্ক শেখায়। আমি তখন অঙ্কের আসল ভ্রান্তি এবং নকল সাফল্য বুঝতাম না। শিরিনের দুঃখ পয়েন্ট-বোর্ডে কতদূর উঠেছিল জানা নেই। শুধু সেই বিচ্ছেদের ধোঁয়াশা-লিপ্ত রাত্রিকে মনে পড়ে। মাসি যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে এলেন। সেই এক নারীর রক্ত-ফোঁসানো রাত্রি আজ মনের তলে কুণ্ডলী পাকায়। সামুদ্রিক জলকম্পনের দীর্ঘনিশ্বাস লাগে। সেদিন মানব-মানবীর বিচ্ছেদের একটা ক্রুর আকৃতি দেখতে পেয়েছিলাম। তার একটা ভিজুয়াল এফেক্ট হয়েছিল আমার মধ্যে। একজন কিশোরীর বুকের কুঁড়ি যৌবনের ভারি বুকের জগদ্দলবন্দী হয়ে হয়তো হাঁসফাঁস করে উঠেছিল। ঘুমজড়ানো চোখে বিছানায় ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেছি। কে যেন বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। দোতলার বারান্দায় বাবা মধ্যরাত্রির নামাজ পড়ছেন জোরে-জোরে। তাঁর কণ্ঠে কেমন একটা বিরক্তি আর ঈষৎ উদ্বেগ মেশানো। নামাজের মধ্য দিয়ে তিনি কোথায় যেন পালিয়ে যেতে চাইছেন। সেতারের এলানো তারে কে যেন বেসুরো আঘাত করে যাচ্ছে। সেই সুর কালো আকাশের গড়ানে নেমে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ-ভাঙা ঘুমের জড়িমায় বাস্তব তখন অস্পষ্ট।

দুই

শিরিনমাসি বিয়ের এক বছরের মাথায় হঠাৎ একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। ধূপঘন সন্ধ্যার অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে দড়ি হাতে করে একাকী গিয়েছিলেন সিঁদুরে আমগাছের কাছে। ডালে লটকে ঝুলছিলেন তিনি। পা দুখানি আলতালিপ্ত এবং ঝুলন্ত ছিল, বাবার হাতের টর্চের আলোয় সাদা ধবধবে পা আমিও দেখেছি। শিরিনের গোঁঙানি শুনে (প্রথমে বুঝিনি সে অমন করে গোঁঙাচ্ছে এবং কোন্‌দিকে ডাকছে) আমরা সবাই দৌড়ে গিয়েছিলাম বাগানের মধ্যে, বাবার হাতের জোরালো টর্চ দাউ দাউ করে জ্বলে

উঠেছিল। গাছ থেকে নামিয়ে মাসিকে যখন শোয়ানো হল খাটের ওপর, মাসির গলায় নীল শিরা তখনও দপদপ করছে। কিছুক্ষণ প্রায় সংজ্ঞাহীন মাসি। পরে সহসা কী এক বিদঘুটে গলায় প্রেতাত্মার মতন কাঁদলেন। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। মাসির মুখে ফেনা উপচে পড়ছিল। মাসি কেন ওইভাবে দড়ি হাতে ছুটে গেলেন, আজও ভাবি। শিরিনের পেটে তখন বাচ্চা এসেছে। গায়ে তাঁর ভরন্ত সুষমা, চোখে টলটলে মাতৃত্ব। সেই দিনই কি মাসির পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়? বাচ্চা ম্যাচিওর্ড হতে পারেনি। অপুষ্ট মৃত মাংসপিণ্ড প্রসব করেছিলেন মাসি। আমরা ভাবতেই পারিনি, মাসি এইরকম কাজ করতে পারেন। মায়ের সাথে ছোটোবোন শিরিনের কোনো বিরোধ ছিল বলে মনে হয়নি। মা তাঁকে বোনের মতন দেখতেন, সতীন ভাবতেন না। তবু কেন মাসি ওইভাবে দুম করে মরতে চেয়েছিলেন? শিরিনের মুখে কখনও পাপের চিহ্ন দেখিনি। তা ছাড়া ওঁকে সবসময় হাসি খুশিই দেখেছি। দুঃখের কথাটাও উনি হাসতে হাসতে বলতেন। এমনকি হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলতেন। সেই শিরিন অমন কাজ করতে চাইলেন কেন? মাসি আত্মহত্যায় ব্যর্থ হযে আগের চেয়ে আলাদা মানুষ হয়ে উঠলেন। ভীষণ শৌখিন ছিলেন তিনি। দামি সাবান, গন্ধতেল এবং বিদেশি সেন্ট্ ব্যবহার করতেন। সেইসব গন্ধিল পারফিউমের মিশ্রিত গন্ধ ছিল বড়োই উতল। এমনকি আত্মহত্যার সেই সন্ধ্যায তাঁর গায়ে সেইসব গন্ধ লেগে ছিল। গন্ধটা এখনও নাকে লেগে আছে। সেই দুর্ঘটনার পর মাসি অন্যরকম হয়ে গেলেন। জানালা খুলে সেই সিঁদুরে গাছটার দিকে চেয়ে থাকতেন। কথা বলতেন খুবই কম। আমি জানালা বন্ধ করে তাঁকে ঘরের খাটে টেনে এনে বসাতাম। বলতাম—অমন করে চেয়ে থাক কেন? তুমি কি মৃত্যুর কথা ভাব? কেন তুমি মরবে? আমরা তো রয়েছি। তোমার কষ্টের কথা আমায় বলতে পার না?

উনি বলতেন—তুমি সব কথা বুঝবে না, মিনু!

শুধাতাম—কেন বুঝব না?

মাসি কোনো উত্তর না করে নিঃশব্দ হেসে চুপ করে থাকতেন। কিন্তু আমি তাঁকে বন্ধুর মতো মনে করতাম। সেই দুর্ঘটনা উনি ভুলতে চাইতেন। আমরাও চাইতাম, উনি ভুলে গিয়ে সুস্থ হয়ে উঠুন। কিন্তু ওই সিঁদুরে গাছ, সেই গাছের মালিক, ঘটনাকে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে চললেন। বাগানের মালিক ছিলেন এক হিন্দু প্রতিবেশী, আমার চাচাদের ভাগে ছিল ওই বাগান। এখান থেকে তাঁরা অন্যত্র উঠে গিয়ে দালান করেছেন। যাবার সময় বাগান বিক্রি করে গেছেন। কিনেছেন গোলোক সমাজদার। চাচারা বাবার ওপর হিংসে করে বাগান

গোলোকবাবুদের দিয়ে গেছেন। গোলোকবাবুর সাধের সিঁদুরে গাছে ওই দুর্ঘটনার পর কী এক দুর্জ্ঞেয় কারণে বউল আসা বন্ধ হয়ে গেল। মুকুল ধরে না। গুটি হয় না। পর-পর দুই বছর এইরকম হল। ধীরে-ধীরে কথা উঠল—গাছে শাপ লেগেছে। অপয়া বউ পেটের বাচ্চা মেরেছে। গাছকে করেছে বন্ধ্যা। গাছ ভয় পেয়ে বোল দিচ্ছে না। কথাটা নানারকম গলায় নানান সুরে খেলিয়ে-খেলিয়ে বলা হতে থাকল। বেশির ভাগ সময় গোলোকবাবুর স্ত্রী পাশের বাড়ি থেকে ওই কথা পাচার কবতেন, গলা বাজিয়ে শিরিনকে অভিসম্পাত দিতেন। বলতেন—আমাদের কেষ্টপুরের বাগানে একবার কাঁঠাল চুরি হল। সোনামুখী গাছ গো। সে কি কাঁঠাল ! কোয়া দেখে চোখ ধরে যায়। জোঁয়ালের সমান সাইজ। চুরি করল এক মুসলমান ছিঁচকে, নফর শাহ্ নাম। শালা ছুঁচকি চোর। অমাবস্যায় চুরি তো। গাছ ডরিয়ে গেল। আর ফল দিলে না। ওইভাবে চুরি হলে গাছের সতীত্ব চলে যায়। গাছেরও তো প্রাণ আছে। মান অভিমান আছে। আমার সিঁদুরি গাছটার সেই হাল করল ওই অপয়া মেয়ে। গাছের বুকে ডর ধরিয়ে দিয়েছে।

এইভাবে দোষারোপ চলত। নানা সুরে কথা পল্লবিত হত। বউল আসার সময় হলে বাগানের পরিচর্যার বহর বেড়ে যেত। গোলোকবাবু নল উঁচিয়ে পাম্প মেশিনে ওষুধ স্প্রে করতেন বউলের পুঞ্জে-পুঞ্জে। সিঁদুরি গাছের কাছে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতেন। মাসি জানালা খুলে সেই দৃশ্য দেখতেন। একবার গাছের তলায় ঘট প্রতিষ্ঠা করে তেলসিঁদুর-পাতাপল্লব দিয়ে পূজা দেয়া হল। ঢাক বাজানো হল। মন্ত্র পড়ে মুসলমানের গাছের হিন্দুত্বপ্রাপ্তি ঘটানো হল। বাবা সেইসব দেখে খেপে উঠলেন। গাছ বিক্রি হয়ে গেল বটে, কিন্তু গাছের চারা তাঁর বাপের হাতে লাগানো। তিনি সহ্য করতে পারলেন না। দাদাজী বেঁচে থাকলে কষ্ট পেতেন ভেবে বাবা কষ্ট পেতে থাকলেন। একদিন গোলোকবাবুর সাথে ওই নিয়ে বিবাদ হয়ে গেল। গোলোকবাবু তলে-তলে নিখিলবিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য হয়েছেন। মা দুঃখ পেয়ে বাবাকে বললেন—ওদের গাছ ওরা যা খুশি করুক, তুমি ঝগড়া করছ কেন ?...বাবা রেগে গিয়ে বললেন—ওদের গাছ ? কে বলেছে ওদের গাছ ? আব্বাজী নিজে হাতে ওই গাছ বহাল করে গেছে। ওইরকম ঢোল বাজালে আব্বাজী কবরে শুয়েও শান্তি পাবে না। আব্বাজীর রুহ্ (আত্মা) কতখানি কষ্ট পায় তুমি জান ? মা বললেন—বউল ধরে না বলে ওরা ঢাক বাজায়। পুজো দেয়। আমরাই তো দোষ করেছি। শিরিন কেন ওই গাছে দড়ি দিতে গেল ?

বাবা-মায়ের তক্কাতক্কি আমি আর মাসি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিলাম

বাবা গরম গলায় বললেন—ওই মেয়েকে আমার তালাক দেয়া দরকার। ও আমার সন্তান খেয়েছে। হিন্দু প্রতিবেশীর সাথে ওরই কারণে বিবাদ-বিসংবাদ হচ্ছে। আমি লীগ করি, হিন্দু রাষ্ট্র, দার-উল-হার্ব, এদেশ দার-উল-ইসলাম নয়। এখানে ধম্ম বাঁচে না। ওই শালা সমাজদাব কতখানি সাংঘাতিক বামুন জান না তো! পারে না যে গাছের গলায় পৈতে পরায়।

শিরিন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ফস করে জ্বলে উঠলেন।—আপনিই বা ওই গাছের মাথায় ইসলামি টুপি পরাতে চাইছেন কেন?

বাবা বললেন—তুমি পাপ করেছ, তাই। লজ্জা করে না তোমার? তোমার জন্যে এইসব, ফের কথা বলতে এসেছ!

শিরিন ধীরে-ধীরে অন্য ঘরে চলে গেলেন। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, সামান্য একটি গাছকে কেন্দ্র করে কী কুচ্ছিত সংস্কার বার-বার শিরিনকে আঘাত করে যাচ্ছিল। বাবা এই দেশকে কখনও নিজের দেশ মনে করেন নি। কথায়-কথায় বলতেন, এই দেশ বিধর্মীর দেশ। দার-উল-হার্ব। এদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। বিধর্মীদেব, কমিউনিস্টদের শাসন জারি হয়েছে। ফতোয়া-ই-আলমগীরিতে রয়েছে, দেশে যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে না, বিধর্মীর শাসনজারি হয়, আদালত ইসলামকে অপমান করে, নাস্তিক মার্কস সাহেবের পূজা করে মানুষ, তখন দেশ দার-উল-হার্ব নয় তো কী? তাই বাধ্য হয়ে উনি জামাত-ই-ইসলামকে পছন্দ করেন। মাঝে-মাঝে সংসার ছেড়ে জামাতে চলে যান। দেশে-দেশে ইসলামি জীবন-বেদ প্রচার করে বেড়ান। একটা বিরাট অংশের ইসলামি যুবশক্তি জোব কদমে এই প্রচার অভিযানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। ছাত্রদের মধ্যে ইসলামি নবজাগরণ ঘটছে। এই দেশের বিধর্মী নেতাদের বিরোধিতার কারণে একদিন ওহাবী আন্দোলন মার খেয়েছে।

এই বিষয়ে তর্ক করতে ভালোবাসেন বাবা। সাদিকুল সাহেব আসেন বাবার কাছে। মার্কসের ভক্ত। রাজনীতি করেন। চাকরি পাননি বলে শহরে একটা টিউটোরিয়াল হোম খুলেছেন। উনি এলে বাবার সাথে 'বাহাস' হয়। বাবা বোধহয় সাদিকুলকে সহ্য করতে পারেন না। মায়ের দিক থেকে উনি আমাদের অতি দূর সম্পর্কে আত্মীয়। আমি মামা বলি। আমার ভাইবোনদের উনি আদর করেন। একমাত্র উনিই শিরিনের সাথে গল্প করার জন্য অন্দরে ঢুকে পড়তে পারেন। মায়ের সাথে নানান কথা বলেন। চা খান। কখনও-বা বাবাকে নিয়ে আমাদের সামনে টিপপনি করেন। বাবা সাদিককে আমল করেন না। বাবারও ধারণা, ছেলেটি ভালো। তবে বিভ্রান্ত। এই দেশের আসল বিপাক কোথায়

ধরতে পারে না। বেকুফ। ভ্যাগাবন্ড।

সাদিক একদিন গাছের প্রসঙ্গ শুনে হেসেই আকুল। খানিক চড়া গলায় হেসে হাসি নিভিয়ে ফেললেন, ওটাই ওঁর স্বভাব। তারপর বললেন—তবে শোনো···

তিন

'তবে শোনো' বলা মানেই ধরতে হবে, উনি এবার খুব মজা করে গল্প শুরু করবেন। সবাই উৎসুক হয়ে উঠলাম, আমি চট করে একটা বুদ্ধি করলাম, বললাম—এক মিনিট। শিরিন-খালামাকে ডেকে নিয়ে আসি। উনিও শুনবেন।

তড়াক করে খাট ছেড়ে নেমে পাশের ঘরে এলাম। দেখলাম, শিরিন জানালা ধরে বাগানের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছেন। ওইভাবে মাসিকে দেখলে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। হাত ধরে টেনে জানালার পাল্লা ঠেলে দিলাম, চেয়ে দেখি, শিরিনের চোখে জল টলটল করছে।

—এ কী, কাঁদছ ?

—না। কিছু না। তুমি আমায় ছেড়ে দাও। আমি ও-ঘরে যাব না। ওই লোকটির রগুড়ে কথা সব সময় ভালো লাগে না।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—মনকে যত খারাপ রাখবে, মন তত খারাপ থাকবে। আমাদের মধ্যে মামাই একমাত্র রঙিন মানুষ। ওঁকে তোমার ভালো লাগে না ?

—না। একদম না। এখন আমাব একটাই রঙ পছন্দ। সিঁদুরি গাছ।

—বেশ তো। মামা তো গাছের কথাই বলতে চাইছেন। কী হল, যাবে না ?

শিরিন পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে এঘরে খাটের একপ্রান্তে বসলেন। শিরিনকে দেখে মামা বললেন সচকিত গলায়—ও ! আপনিও এসে পড়েছেন ? এবারে বুবুকে (মানে মাকে) ডেকে আনো, মিনু। বোটানিক্যাল গার্ডেনের দুটি গাছের গল্প আমি শোনাব। একটি হল ফুল। নাম হল লিলি। দুই হচ্ছে একটি হতভাগ্য খেজুর। যাও।

বললাম—মা আসবেন না। রান্নায় ব্যস্ত।

মামা বললেন—বেশ, তবে শুরু করি। কথা হল, গাছেরও প্রাণ আছে, বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন। গাছ অনুভূতিপ্রবণ প্রাণী। ওর হিংসা আছে। ভালোবাসা আছে। ঘৃণা করে গাছ। গাছ আহ্লাদিত হয়। শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে সেবার গেলাম। গাইড একটা ডোবার সামনে এনে বললে—ওই যে দেখছেন পদ্মপাতার মতন বিশাল পাতা, ওটা পদ্ম নয়। ঐ ফুলও পদ্মফুল নয়।

দেখতে পদ্মপাতার মতনই বটে। ওটা একজাতের লিলি। পদ্ম পাতা অতখানি প্রকাণ্ড হয় না। ওই পাতায় একটি এক বছরের মেয়ে-বাচ্চা বসে থাকতে পারে। ডুববে না।*

প্রশ্ন করলাম—মেয়ে-বাচ্চা কেন? ছেলে হলে কি ডুবে যাবে?

গাইড বলল—অবশ্যই ডুববে।

—কেন?

—সেটা বলতে পারব না। কারণ একটা আছে নিশ্চয়। তবে বোধহয়, লিলি মেয়েদের ভালোবাসে। পুরুষদের সহ্য করে না।

বলতে-বলতে গাইড এগিয়ে গেল। গাইডের কথা কেউ-বা বিশ্বাস করছিল, কেউ করছিল না। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমাদের মনোভাব টের পেয়ে গাইড নদীর ধারে একটি বটগাছের কাছে এনে বলল—দেখুন। গাছ কেমন হিংস্র হয়। ঝুরি দিয়ে খেজুরটাকে জড়িয়ে কেমন করে মেরে দিয়েছে। দেখি তাই, শূন্য খাঁ খাঁ করছে গাছ। মস্তকহীন নিষ্পত্র খেজুর। মরে গেছে। মৃত অবস্থায় বটের নিষ্পেষণে দাঁড়িয়ে কী করছে গাছ? খেজুরের মাথায় একটা শকুন চুপচাপ বসে ঝিমোচ্ছে। দেখে, ভেতরটা চমকে যায়।

শুনতে শুনতে শিরিন দুহাতে মুখ ঢেকে শিউরে একধারা আর্ত-অস্ফুট শব্দ করলেন। সেই শব্দ কান পেতে শুনে ম্লান হাসলেন সাদিক। তারপর বললেন— বিজ্ঞাণীরা একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তাতে গাছের হার্ট-বীট, পাল্‌স্‌-বীট ধরা পড়ে শুনেছি। শোনা কথা। এক বিজ্ঞানী ওই যন্ত্রে চেয়ে দেখে নাকি গাছের উল্লাস এবং বিষাদ অনুভব করতে পারেন। উনি গাছ ভালোবাসেন বলে গাছও তাঁকে ভালোবাসে। যেখানে তিনি গবেষণা করেন, সেখানে সেই যন্ত্রটা আছে। তার কাঁটা বিজ্ঞানীকে দেখতে পেলে কেঁপে ওঠে আহ্লাদে। সেই বাগানে কাঁচি হাতে মালি ঢুকলেই ঐ কাঁটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনা স্টাডি করে বিজ্ঞানী বুঝলেন, গাছেরও খুশি-হওয়া, ভয়-পাওয়া বলে একটা ব্যাপার রয়েছে। অতএব শিরিনকেও সিঁদুরি গাছটাকে খুশি করতে হবে। কথা শুনে শিরিন সাদিকের দিকে চোখ তুলে স্পষ্ট করে তাকালেন। মামাকে আমি আগেই মাসির মনের সব অবস্থা বলে দিয়েছিলাম। মামা বললেন—দেখুন, মেয়েদের শুধু মামাশ্বশুর-ভাগনেবউ (লাজুকলতা) হয়ে থাকলেই তো চলে না, মেয়েদের

* বোটানিক্যাল গার্ডেনের গাইডদের মুখে এই ধরনের জ্যান্ত উক্তি বাস্তবিক প্রচলিত। সেটা কি শুধুই গল্প?

কিঞ্চিৎ লিলিও.হতে হয়। সিঁদুরি গাছের কাছে গভীর রাতে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলবেন, আমায় ক্ষমা করে দাও, আমি তোমারই মতন অসহায়। আমি কখনও আত্মহত্যা করব না। আমি আখতার হাজীকে একটা সন্তান উপহার দেব। তুমি পুষ্পিত হও। বলতে-বলতে সাদিকুল উঠে দাঁড়ালেন, শিরিন সাথে-সাথে বাধা দিয়ে বললেন—উঠছেন কেন ? বসুন, চা খেয়ে যাবেন।

শিরিন হঠাৎ যেন খুশি হয়ে উঠেছেন। খাট ছেড়ে নেমে রান্নাঘরে চলে গেলেন। ছোটোরাও খেলতে চলে গেল। বিকাল হয়ে আসছে। চা খেতে-খেতে মামা আরো কিছু গভীর কথা তুললেন। বললেন—লিলির একটা প্রতীকমূল্য আছে মেয়েদের জীবনে। গাছের নিজস্ব কোনো সংস্কার নেই। ধর্ম যা তা-ও খুব প্রিমিটিভ। ক্ল্যান যুগেরও ওপারে পড়ে আছে বৃক্ষ লতাপাতা। কারণ ওরা মানুষের চেয়েও পুরনো প্রাণ। ওদের আমাদের মতন কোনো গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম কখনও ছিল না। আজও নেই। বুঝলে মিনু, একথা গোলোকবাবু কিংবা তোমার বাবা বুঝতে চাইবেন না। কেন বলো তো ?

শুধালাম—কেন ?

সাদিক বললেন—কারণ উনি মনে করেন শবেকদরের রাতে বৃক্ষলতাপাতা আল্লাকে সিজদা (প্রণাম) করে। মোনাজাত (প্রার্থনা) করে। যাঁরা পরহেজগার (নৈষ্ঠিক পুণ্যাত্মা) তাঁরা গভীর রাতে স্বচক্ষে নাকি সেই নামাজপড়া দেখতে পান। তোমার বাবা হাজী আখতার এম· এল· এ· (মুসলিম লীগ) আমায় পরম বিশ্বাসের সাথে একথা বলেন। আমি সেকথার প্রতিবাদ করিনি কেন জান ?

—কেন ? প্রশ্ন করি।

মামা বলেন—কারণ মানুষ বরাবরই গাছপালার মধ্যে নিজের চৈতন্যকে আরোপ করে। যে যেমন সে ঠিক তেমনি করেই করে। মানুষ সব সময় তার নিজস্ব ক্যাটেগরি অব থট্‌স্‌, চিন্তার রকমের মধ্যে রয়েছে। তার সব অনুভূতি ওই চিন্তার রকমের মধ্যে বিরাজ করে। লালন ফকির থেকে আইনস্টাইন সবার বেলা একই কথা। জীবনানন্দও গাছের মধ্যে নিজের চৈতন্যকে দেখতে পেতেন। তাঁর একটি গল্প বলি শোনো। উনি অন্য কবিদের একবার অদ্ভুত একটা কথা শুনিয়ে বললেন, আমি অন্ধকারের তরঙ্গ দেখেছি। তোমরা দেখবে ? সত্যিকার তরঙ্গ দেখা যায়। এটা কবিকল্পনা নয়, চাক্ষুষ ঘটনা সেটা। অন্য কবিরা চাক্ষুষ করতে চাইলেন। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা পায়ের কাছে মেঝেয় রেখে সাদিকুল সটান হয়ে চেয়ারে বসলেন। রুমাল বের করে ঘাড় গলা মুখ মুছে প্যান্টের পকেটে ফের ঢুকিয়ে রাখলেন। চশমাটা ঠিকমতন নাকে বসিয়ে আমাদের দিকে প্রসন্ন হয়ে চেয়ে দেখলেন। শিরিন দুই চোখে কথাগুলি

গিলে নিচ্ছিলেন। শিরিনের চোখ থেকে চোখ টেনে সাদিক আমার দিকে চেয়ে বললেন—জীবনানন্দ তারপর কবিদের দল বেঁধে গভীর রাতে এক গাছতলায় নিয়ে গিয়ে ফেললেন। বিষম অন্ধকার। গাছের তলায় গিয়ে জীবনানন্দ একখানা শুকনো ডাল, ওই গাছেরই ডাল, কুড়িয়ে নিয়ে গাছের দিকে লক্ষ করে ছুঁড়ে মারলেন। গাছের ডালে পাতায় গিয়ে আঘাত করা মাত্র সেই গাছের বাসিন্দা পেঁচা আর বাদুড় সশব্দে চেঁচিয়ে উঠে উড়াল দিয়ে শূন্য আকাশে উড়ে গেল। তাদের পাখার ঝাপটা লেগে চারপাশের অন্ধকার কেঁপে উঠল! জীবনানন্দ আঙুল তুলে দেখালেন, দ্যাখো, কী চমৎকার ঢেউ উঠছে। দেখলে ?

আমরাও মনে-মনে সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম। মামা বললেন—ঘটনাটা একই। গাছকে যাঁরা নামাজ পড়তে দেখেন, তাঁরা প্রাচীন। আর অন্ধকারের গায়ে যাঁরা ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখেন, তাঁরা আধুনিক। এই যা তফাত। কিন্তু কবির তরঙ্গ দেখার মধ্যে কোনো স্বার্থ ছিল না। জীবনানন্দ গাছের কাছে ফল চেয়ে কাঁদেন নি। চেয়েছিলেন নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য। অন্য কবিরা শুধিয়েছিলেন, গাছে যে শুকনো ডাল ছুঁড়ে মারলেন, সেটা কেন ? কবি বললেন—ঠিকই করেছি। গাছ তো এখন ঘুমিয়ে। আমি ওরই ডাল দিয়ে ওকে ছুঁয়ে দিলাম। গাছ জাগল না। কষ্ট পেল না। আমারও তরঙ্গ দেখা হল। অন্যরা প্রশ্ন করলেন—পাখিগুলো যে উড়ে পালাল, তাতেও তো ঘুম ভেঙে যেতে পারে ? কবি বললেন—না। তা নয়। ঘুমের মধ্যে প্রিয়জনের হাত-পা এসে আমাদের গায়ে পড়ে, আমরা দিব্যি ঘুমিয়ে থাকি, এ-ও ঠিক তাই। চলো, গাছ ঘুমিয়ে থাক। আমরা যা দেখবার দেখে নিয়েছি।...তাই বলছিলাম। বলে সাদিক চুপ করে রইলেন।

—বলুন! অস্ফুট বললেন শিরিন।

সাদিক বললেন—গাছের কাছে ক্ষমা চাইবেন। প্রার্থনা করবেন গাছ যেন ফুটে ওঠে। বলবেন, আমি তোমার ফল নেব না। আমি শুধু দূর থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখব। ব্যস! গাছ তখন খুশি হয়ে...

বলে আর কথা শেষ করলেন না সাদিকুল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে-পায়ে বারান্দায় এলেন। হঠাৎ কী মনে পড়াতে ঘুরে দাঁড়ালেন। আমরাও ওঁর পিছু-পিছু এগিয়ে এসেছি। শিরিন শুধালেন—আচ্ছা সাদিক, লিলির প্রতীকমূল্যটা কী সেটা তো বললেন না ?

সাদিক নিঃশব্দে হেসে ফেলে বললেন—আপনার মনে আছে দেখছি। অল্প কথায় বলব হাতে আর সময় নেই। কালই শহর চলে যাব। একটু এখন তাড়া আছে।

—বেশ। তাই বলুন। শিরিন সম্মত হলেন।

সাদিক তখন এতক্ষণ বাদে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধুঁয়ো ছেড়ে বললেন—লিলি পুরুষকে ঠিক সহ্য করে না। বইতে পারে না। গাইডের কথার মধ্যে এইরকম একটা ইঙ্গিত ছিল। তাই না? আবার একটা টান দিলেন উনি। সিঁড়ির দিকে এগোলেন। সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে থেমে গিয়ে বললেন—ইউরোপের দেশগুলোর মতন, আমেরিকার মতন, এদেশেও মেয়েদের একশ্রেণীর মধ্যে একটা ট্রেন্‌ড্‌ দেখা যাচ্ছে। সেটা ফিমেল লিব নামে চলছে। মেয়েরা তাদের নিজেদের মধ্যে একটা সর্পিল যুদ্ধ, প্রচণ্ড আগ্নেয় নারীসত্তাকে শ্রদ্ধা করতে চাইছে। স্বাধীনতার একটা তুমুল কনসেপট বলা যায়। সেটা ঠিক কিনা জানি না। হয়তো নয়। কারণ সেই ক্ষোভ, নিজেকে সম্পূর্ণ এক রক্তাক্ত জীবন-পিণ্ডে পরিণত করা এবং পুরুষকে দলিত করার ইচ্ছে, যৌন-দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যৌনতার স্বাধীন উচ্ছ্বাস পেতে চাওয়ার অভিপ্রায়, এই আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েদের জৈব বৈশিষ্ট্য আর দেহের নারীলক্ষণগুলোর মধ্যেই রয়েছে তার চিরকালের অপমান। তা সেইসব কথাগুলো ঐ শিবপুর গার্ডেনে গিয়ে লিলিকে দেখে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল। আমার খুব ভালো লেগেছিল, ওই বিরাট গোলপাতা, সেই রক্তাক্ত ফুল, বেশ প্রতিবাদী, পুরুষ-বাচ্চাদের ডুবিয়ে দেয়। নেয় না।

বলতে-বলতে সাদিকুল হো-হো হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে চলে গেলেন।

চার

তারপর থেকে শিরিনের সত্যিকার তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। একদিন মাঝরাতে ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন। আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললেন—চলো। সিঁদুরি গাছকে সাদিকের কথাগুলো বলে আসি।

আমি চমকে উঠলাম। সাদিক তো মজা করে গল্প বলে গেছেন। হতভাগিনী সেইসব গল্পকে সত্যি মনে করেছেন। সাদিকের কথার এত দাম দিতে হয়? আমি যেতে রাজি না হলে একাই এই অন্ধকারে চলে যেতে চাইলেন। অগত্যা আমাকেও যেতে হল। এই অবস্থায় গোলোক-পত্নী দেখলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাওয়ার কথা। ভয়ও হচ্ছিল খুব। গাছের কাছে নতজানু হয়ে পাগলের মতন বিড়বিড় করতে লাগলেন শিরিন। ওঁর কেমন নিশির দশা হয়েছিল।

কয়েক রাত এইরকম চলল। সাদিকের সব কথা আমি স্পষ্ট বুঝতাম না। সব কেমন অ্যাবসার্ড মনে হত। ধরে নিতাম ওগুলো গল্প। কিন্তু আসলে সাদিক শিরিনকে কী এক দুর্ভেদ্য চৈতন্য দিয়ে বিদ্ধ করেছিলেন। সাদিক শিরিনকে বড়ো জোর আমারই মতন খুকি মনে করতেন। মাঝে-মাঝে এমন কথা বলতেন, যা আমার সামনে বলা উচিত নয়। কিন্তু বোধহয় তিনি ফুলের গল্প, গাছপালার গল্প বলে চিন্তার একটা রকম বা পরিমণ্ডল গড়ে কাঁচা-কাঁচা কথার আদলে জীবনের একটা কনসোলেশন খুঁজে দিতে চাইতেন। ভাষার চমকপ্রদ বাক্যবন্ধে গুরুতর সেক্স নিয়েও আলোচনা করতেন। মানুষটা একারণেও আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কখনও অশ্লীল কথা বলতেন না। আবার শিরিনকে যে ভালোবাসেন সে-ইচ্ছেও কখনও ধরতে দিতেন না। উনি যখন চলে যেতেন, শিরিন বড়ো কাহিল হয়ে পড়তেন। তার কথার একটা ম্যাজিক-এফেক্ট ছিল। কিন্তু তখন ধরতে পারিনি, ফিমেল লিব বলে কথাটা যে উনি বলে গেলেন, বললেন, লাজুকতা নয়, লিলি বিদ্বেষ, দৃঢ়তা, তার বিদ্রোহ, সবই একজনের অন্তরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া এনে দিয়েছিল।

বাবা যেদিন শিরিনের ঘরে ঢুকতেন তাহাজুদের নামাজশেষে, সে রাত ছিল অত্যন্ত পাশবিক। শিরিন কাঁদতেন। মনে হত, শিরিনের গায়ে জোর করে কে যেন সুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। এক ধরনের বোবা কান্না শোনা যেত। ধর্ষণের সময় মেয়েরা বোধহয় অমনি করে কাঁদে। মাঝে-মাঝে পশুর মতন গোঁঙাতেন শিরিন। মা কেবল কপালে করাঘাত করে বলতেন—মেয়েটাকে শেষ করে দিলে হাজী। মেরে ফেললে গো।

আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতাম, কিন্তু শিরিন চাইতেন ফুল ফোটাতে, পারতেন না। একদিন বললেন—আমি পারব না, মিনু। আমি পাগল হয়ে যাব।

—কেন পারবে না খালামা? তোমায় পারতেই হবে।

—না, মিনু। হয় না। সাদিক আমার সব ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে। ওই গাছ আমায় মৃত্যুর কথা বলে। সমাজ আমাকে অভিশাপ দেয়, আমি কোথায় যাব?

আমি দেখেছিলাম, শিরিনের কনট্রাডিকশন সাদিকের ক্যাটেগরি অব থট্‌স্‌-এর মধ্য থেকে সংক্রামিত। লিলির বিদ্বেষ এবং বউলের প্রার্থনা একসাথে মেলে না। লোকটিকে আমার ভয়ও হয়েছিল। তাঁর সফিসটিকেশন, একটা মায়াজড়ানো জাল, বিভ্রান্ত দর্শনের ছায়া, পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের মিশেল, যা মানুষকে সাময়িক মুগ্ধতা এবং সান্ত্বনা দেয়। আখেরে কোথায় টানে কে জানে। পরে একথা আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়েছিল।

পাঁচ

শিরিন-মাসির কথা বলতে গেলে আমায় অনেক টুকরো-টুকরো দৃশ্যের আশ্রয় নিতে হয়। একদিন স্কুল থেকে ফিরে মাসির সাথে সিনেমায় যাওয়ার প্রোগ্রাম। বাড়ি ফিরে দেখলাম, মাসি কোলের ওপর বোরকা ধরে উদাসীন চেয়ে আছেন জানালার শূন্যতায়। সেজেছেন মাসি। কানে দুল। পায়ে আলতা। নাকে সাদা পাথরের ফুল। গলায় চিকনহার। তার ওপর এখন বোরকা চাপাতে হবে। শাড়িখানাও বেনারসি। সব বৃথা। সব সৌন্দর্য অন্ধকারে ঢাকতে হবে। দেখে বড্ড মায়া হচ্ছিল। অথচ আমার বেলা বোরকার কোনো আবশ্যকতা নেই। এর কারণ বুঝতে পারতাম। একদিন নিশিপিসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম সবাই মিলে। বাবাও সাথে ছিলেন। সাধারণত আত্মীয়ের খানাপিনাতেও শিরিনকে সাথে নেওয়া হত না। বাড়িতে এক বুড়ি দাসীর হেফাজতে তাঁকে রেখে যাওয়া হত। সেদিন কী মনে করে ওঁকেও নেওয়া হয়েছিল। বাসে যাচ্ছি আমরা। আমরা বসেছি মেয়েদের আসনে। শিরিন আছেন সব-শেষ প্রান্তে একজন মহিলার পাশে। কিছুক্ষণ বাস চলার পর পাশের মহিলা বোরকার পাশে থেকে উঠে স্টপে নামলেন। জায়গাটা খালি ছিল বলে একজন পুরুষ শিরিনের পাশে বসে পড়লেন। সাথে-সাথে বাবা পুরুষ-আসন ছেড়ে উঠে এসে লোকটিকে বললেন—আপনি যাঁন, আমার সিটে গিয়ে বসুন। লোকটি বেকুফ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ঠিক আছে, আমি আর বসব না। লোকটি রড ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবা শিরিনের পাশে আগলে জেঁকে বসলেন। আমার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। আমার ছোটো ভাই বেশ বড়ো হয়েও মায়ের দুধ খেত বলে বাবার নির্দেশ ছিল, দুধ খাওয়ানোর সময় বাচ্চার দুহাত পেছনে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। নইলে ছেলে মায়ের বুকে হাত দেবে। এই দৃশ্য শিরিনও দেখেছেন। প্রথম যেদিন দেখেন সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়েছিল তাঁর। অস্ফুট বলেছিলেন—হায়! কী নিষ্ঠুর! দুধের বাছাও মায়ের শরীর স্পর্শ করতে পায় না। এ কোথায় এলাম আমি? এ তোমরা কোথায় পাঠালে, মা! ভাইয়া গো! এ কোন্ দুনিয়া!

শিরিন-মাসি বোরকা-কোলে বসে ছিলেন। আমায় দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। নিঃশব্দ সেই কান্না। কোনো শব্দ নেই, একটু অনুকার অব্দি। খানিক পর শক্ত হয়ে বললেন—আমি যাব না, মিনু। তুমি একা যাও।

বলে উনি কানের দুল খুলে ফেললেন ড্রেসিং টেবিলের বড়ো কাঁচের আয়নার সামনে টুলে বসে। গলার হার শাড়ি ইত্যাদি সবই খুলতে থাকলেন। আজও

সেই দৃশ্য মনে ভাসে। আজও শিরিনের কান্না আমি দেখতে পাই

ছয়

মাঝে একদিন আবার সাদিকুল এসেছিলেন। বাবা ধর্মপ্রচারে বেরিয়েছিলেন সেই সময়। অনেক রাতে উঠে টিফিন ক্যারিয়ার ভরতি করে টিন ভরতি করে খাবার তৈরি করতে হয়েছিল শিরিনকে। বাবা শিরিনের তৈরি খাবার ছাড়া নেবেন না। শিরিন অসহ্য হয়ে উঠতেন। পাঁচ বেলা নামাজ পড়তে চাইতেন না। তা নিয়েও বাড়িতে বাবার সাথে অশান্তি। অবশ্য আমি ছাত্রী বলে সবকিছুরই বাইরে থাকার অধিকার ছিল আমার। যাই হোক। বাবা কোন্ এক পীরের কাছেও গিয়েছিলেন সেবার। লীগের লোকেরা বাড়িতে এসে বাবাকে না পেয়ে মন খারাপ করেছিলেন। রাত্রিভর ওঁরা আলোচনা করেন। ঘন ঘন চা দিতে হয়। খাবার দিতে হয়। সবই দিতে হয় শিরিনকে রাত্রি জেগে। বোরকা খুলতে হয়, আর পরতে হয়। শিরিন দম বন্ধ করে কেবলই বলেন, মাই লাইফ ইজ হেল। জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি। কী করে হাসি, মিনু ?

শিরিনকে মাঝে-মাঝে বাবাকে পুঁথি পড়ে শোনাতে হত—আহারে দুলদুলি ঘোড়া, জোর করো থোড়া-থোড়া, যেতে হবে টুঙ্গির শহর। সেই কথাগুলো আবৃত্তি করে শিরিন আপন মনে বলে উঠতেন, কিন্তু কোথায় যাব আমি ?

সেই সময় সাদিকুল এলেন। তাঁকে দেখেই শিরিনের প্রথম প্রশ্ন—ফিমেল লিবটা আমি বুঝতে পারিনি। আর-একবার বুঝিয়ে বলবেন ?

সাদিক বললেন—মিনু বরং ওদিকে যাক।

—কেন ? ও-ও শুনে রাখুক। কাজ দেবে। অবশ্য সাবধানে বলবেন।

—আমি কি অসাবধানে কিছু বলেছি কখনও ? সাদিকুল চোখ বিস্ফারিত করে হাসলেন। শিরিন বললেন—না না, তা কেন ? তবে কিনা, আরো বেশি সন্তর্পণে, সতর্ক আর সজাগ হয়ে শুনতে চাইছি তো !

আমি শুধালাম—এইসব কথা শুনে তুমি কী করবে খালামা ? জ্ঞান মানুষকে দুঃখ দেয় জান না ?

শিরিন বললেন—আমি যে দুঃখই চাই, মিনু। জেনে দুঃখ পাওয়াও আনন্দের। না জেনে কেবল তারাই সুখী হয়, যাদের মস্তিষ্ক মানুষের নয়।

—বাঃ চমৎকার বলেছেন। আমি বলি, নলেজ ইজ পাওয়ার। বললেন সাদিক। শিরিন তখন হঠাৎ করে প্রস্তাব করলেন—চলো আমরা ছাতে যাই।

চৈত্রের বিকাল। ভালো লাগবে। তিনখানা বেতের মোড়া নিলেই চলবে। কী বলেন ? বাইরে রাস্তায় আইসক্রীম হেঁকে যাচ্ছিল—বললাম—চট করে নিয়ে আসি। খেতে-খেতে গল্প করা যাবে। বলেই আমি নীচে নেমে আইসক্রীম নিয়ে ছাতে উঠলাম। খেতে গিয়ে ছেলেমানুষের মতন তিনজনেরই খুব হাসি পাচ্ছিল। শিরিন মুগ্ধ হয়ে সাদিকের চোখে কিসের ভাব বিনিময় করতে চাইছিলেন। আমি লক্ষ করেছি। চৈত্রের শেষ বিকালের আলো আমাদের গায়ে এসে লাগছিল, একটু মিষ্টি হিম লেগেছিল বাতাসে। মা একবার ছাতে উঠে এসেছিলেন। মাকে বললাম—তুমি একটা আইস খাবে, মা ? মা মিঠে হেসে বললেন—তোমরাই খাও, বাছা। সবই তোমাদের ছেলেমানুষি। নেহাত আজ তোমাদের বাপজান নেই।

বলতে-বলতে মা নীচে চলে গেলেন। তখন কথা শুরু হল। আমি কিছুক্ষণ বসে শোনার পর মোড়া ছেড়ে ছাতের অন্যপ্রান্তে সরে এসে পায়চারি করে ঘুরতে লাগলাম। সব কথা আমার শোনা উচিত নয়। মাসির যৌন-জীবনের কিছু সমস্যা আছে বুঝতে পারতাম। সাদিক কথা বলে যাচ্ছিলেন, বারবার আমারও কান উৎকর্ণ হচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম উনি বলছেন, মানুষের সমাজবিকাশের সাথে-সাথে মানুষের সেক্সুয়াল লাইফ কীভাবে স্তরে স্তরে উন্নত হয়ে কীভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। সেটা এখন অনুভূতির এক অতি সূক্ষ্ম স্তরে একটা আর্টিসটিক অ্যাপ্রোচ, লাইফ অ্যাপ্রোচ তৈরি করেছে। পশুত্বের পর্যায়ে মানুষের সেক্স পড়ে নেই। নারী-পুরুষের এই সম্পর্ক শুধু দেহগত নয়, তার অনেকখানিই মানসিক।

শুনতে-শুনতে শিরিনের মধ্যে যৌন-জীবনের এক সুন্দর আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। সেটা নিবারণ করবে কে ? সাদিকুল বলছিলেন—শুনেছি অনেক পুরুষের মধ্যে একটা পাশবিক খাই-খাই ভাব থাকে। নারীর দেহ পেলেই তাদের জিভ কুকুরের মতন ঝুলে পড়ে। এসবই শোনা কথা। আবার এমন মানুষও আছে, যার স্পর্শ অবধি খুব আর্টিসটিক। সবটাই নির্ভর করছে নারীপুরুষের রুচি-অনুভূতির একটা সমান তরঙ্গের ওপর। আমি বই-পড়া কথা বলছি কিন্তু। আপনিই হয়তো ভালো বুঝবেন। এখন কথা হল, কার যে লাজুকলতায় আসক্তি এবং কার লিলির মেরুদণ্ডে মুগ্ধতা, সেটাই প্রশ্ন। মেয়েদের দেখবেন, হাঁটাচলার মধ্যে, বসার মধ্যে একটা কেমন শরীর গোপন করার ব্যস্ততা, চোখ যেন নিজেরই দিকে, এটা ইংরাজ মহিলার হয় না। কারণ বহুকিছু। ওখানেও সেক্স-এর আপীল থাকে। কোনোটা সামন্ততান্ত্রিক, কোনোটি গণতান্ত্রিক ভ্যালুজ থেকে আসে। মেয়েদের চলার ছন্দেও ঢলানি থাকে। থাকে একটা দৃপ্ত ভাব। তা

আমি বলছিলাম, আপনাকে সব জেনেও মানিয়ে চলতে হবে। ফুল ফোটানোই আপনার কাজ। আমি উঠব।

আমি লক্ষ করলাম, মাসি হতভম্ব হয়ে গেছেন। ওঁরা নেমে পড়ছেন আগে-আগে, আমায় ওঁরা লক্ষই করেননি। পেছনে আমি। সব আগে সাদিকুল। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। সিঁড়িতে ওদের দেখা যাচ্ছে খুবই অস্পষ্ট। ছাতের সিঁড়ি বলে একটা জায়গা খুবই অন্ধকার। মাসি একটা বড়ো রকম ঝাঁপ দিয়ে টপকে নামলেন সাদিকের সিঁড়িতে। বোধহয় সাদিককে স্পর্শ করলেন। সাদিক বললেন—শুনেছি মানুষের একটি চুম্বনের পরমায়ু সারা জীবনের সমান। কী জানি, কথাটার কী মানে? তুমি জান শিরিন?

শিরিন বললেন—তুমি আমায় দেবে?

—কি দেব তোমায়?

—ওই যে বললেন সারা জীবনের সমান যার পরমায়ু?

—না, শিরিন। এই অবস্থায় ওটা বড্ড ছেলেমানুষি হবে। তুমি ঘরের বউ। আমি ভ্যাগাবনড। আমার কাছে কথা ছাড়া কিছুই চেও না।

ওই অন্ধকারেই সাদিক সেদিন হারিয়ে গিয়েছিলেন। আমি পিছু হটে ছাতে ফিরে এসেছিলাম। জোর হাওয়া দিচ্ছিল ছাতে। পাতলা একফালি চাঁদ ছিল সন্ধ্যায়। ছাতে ঘুরতে-ঘুরতে আমার বুক খালি হয়ে গিয়েছিল। স্বল্পশিক্ষিতা, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়েটি সাদিকুলের চিন্তার দান গ্রহণ করে করে মনের একটি এমনই গড়ন তৈরি করে নিয়েছিলেন যে আমাদের সংসার তাঁর পক্ষে কারাগার হয়ে উঠেছিল।

সাত

সেদিনও রাত্রে বাবা মাসির ঘরে ঢুকেছিলেন। সেই চাপা ক্রুদ্ধ ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আমি মানুষের যৌন-জীবনের কোনো বিকৃতির কী রহস্য জানি না। মাসি কেন চিৎকার করেন, জানতাম না। কেবলই বুকটা শুকিয়ে যেত। এই অসহনীয় ঘটনা বাবার সম্পর্কেও আমায় বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। বাবা বরাবর মাসিকে তাঁর ভুক্তাবশেষ খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন। থালায় খেতে-খেতে কিছু অবশেষ রেখে দিয়ে বলতেন, তুমি খেও, শিরিন। মাসি সেই থালা উঠিয়ে এনে গোরুর নাদায় ফেলে দিতেন দেখেছি। একবার আমারই চোখের সামনে পেঁপের ফালি কুকুরের মুখে ফেলে দিলেন। কুকুর পেঁপে খায়

না। শুঁকে দেখল। খেল না। উঠোনে পেঁপের ফালি পড়ে রইল। তা নিয়ে বাবা মাসির ওপর অনেক তম্বি করেছিলেন। মারতেও কসুর করেন নি। বাবার বয়েস হয়েছিল। মাসিকে মারার পর ঘেমে নেয়ে উঠলেন। ধুঁকতে লাগলেন। মাসিকে হাতপাখার ডাঁটি দিয়ে পেটালেন। মাসির গায়ে কালশিটে রক্তাক্ত দাগ হয়েছিল। বাবা মারার পর চেয়ারে বসে ঘন-ঘন পাখা নেড়ে নিজেকে হাওয়া দিচ্ছিলেন আর ধোঁকাতে-ধোঁকাতে বলছিলেন—টাকায় ষোলোটা মেয়ে। একটা ফাউ। মনে রেখো। আলাউদ্দিন খিলজির আমলে তিনটি ছাগল বেচে একটা মেয়ে খরিদ করা যেত হাট থেকে। একটা ছাগল তিন টাকা। একটা মেয়ে ন-টাকা। আমি তোমাকে পাঁচ বিঘে জমি দিয়ে কিনেছি। শহরের মাটি দিয়েছি। মেড়োরা সেখানে বাড়ি বানিয়ে ব্যবসা করছে। শুনছি লস খেয়েছে বলে আড়ত তুলে দিয়ে দেশে চলে যাবে। তখন সেই বাড়ি তোমারই। এত সুখ কে দেয়? আরবের শেখেরা হলে তোমার মতন কসবিকে এই হাটে কিনে ওই হাটে তালাক দিত। তখন তিন টাকাতেও তোমায় কেউ কিনত না। তা বলে, আমি তোমাকে সাদিকের হাতে ফাউ-তোলা দিতে পারি না। শালা যে লোভে-লোভে আসে, সব মতলব চিনি। তবে কিনা, জালি ছোকরা বলে মাপ পেয়ে যাচ্ছে। ঘরের বউ পরপুরুষের সাথে এত কথা কিসের বলে? বাবা আড়ালে সাদিককে এই ধাবা বলতেন। সামনে পেলে আরব মুলুকের গল্প করতেন, কাফেরদের কেচ্ছা শোনাতেন। ইব্রাহিমের পাথর মক্কায় রয়েছে। নাম হাজারে আসুয়াদ। তাতে হাজীরা চুমু দেয়। এতই তার আকর্ষণ, মুখ তুলতে ইচ্ছে হয় না। এতই তার টান। দুই ঠোঁট শক্ত আঠার মতন লেগে যায়। বুঝলে সাদিক, সংসারটাই এইরকম। ছোটো বউ হল সেই হাজারে আসুয়াদ। টেনে ধরে আছে। ছাড়ে না। ছাড়াতে পারি না। হেঃ হেঃ! সবই খোদার কুদরত। মেয়েরা হল, তোমাদের ইংরাজি ভাষায়, ম্যাজিক-স্টোন। হাজারে আসুয়াদ। তাই কিনা?

বাবার কথা শুনে সাদিক নিজেকে কাহিল করে হাসতেন। বলতেন—শুনেছি, হাজীরা যখন ঐ পাষাণে পাগলের মতন চুমু খায়, ছাড়তে চায় না, তখন পুলিশ ওদের জোর করে তুলে দেয়। গুঁতোয়। গলায় ধাক্কা দিয়ে তোলে। ভেরি ডিসটারবিং।

—ঠিক বলেছ সাদিক। মোক্ষম কথা।

—আমি তবে সেই পুলিশ।

—অ্যাঁ! হ্যাঁ হ্যাঁ তাই।

বলেই দুজন চোখাচোখি চোখ মটকে হাসতেন। আমারও মনে হয়, আমাদের সংসারের সাদিকুল সত্যিই ডিসটারবিং এলিমেনট। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য।

সেই রাতেও ধীরে-ধীরে একসময় কান্না স্তিমিত হয়। তারপর সব ঠাণ্ডা। তারও কিছু পরে পড়া ছেড়ে মায়ের ঘরের দিকে জল খাওয়ার জন্য গিয়ে দেখি মেঝেয় ওরা বসে। মা আর মাসি। মাসির শাড়ি এলোমেলো। চোখ মুখ থমথমে। যেন সর্বাঙ্গে ঝড় বহেছে। গালে গলায় আঁচড়। আমি বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাসি বলছেন—আমাদের নিম্নাঙ্গের যে নারী-চিহ্ন, তোমায় বলি বুবু, ওটা একটা কদর্য কুৎসিত জন্ম-দাগ। আমার কোনো রোমাঞ্চ নেই, বুবু। আনন্দ পাই না। কেন বুড়ো আমায় জ্বালাতন করে! একজন গোঁড়া সাম্প্রদায়িক লোক, আমায় গমন করুক, আমি চাই না। খাব-দাব আর রস বিলোব, আমি পারব না; আমার ঘেন্না করে। আমার ঘরে বুড়ো কেন খোমেইনির ফটো টানিয়েছে? ওই তছবির দেখে কখনও নামাজ হয়? আমায় সেদিন নজরুলের ফটো টানাতে দিলে না। কেন? বলো? গাছে ফল হয় না বলে আমায় দোষী করা কেন? ওই গাছ যেমন ভয় পায়, আমিও পাই। যেদিন বুড়ো আমায় প্রথম ছুঁয়েছে, সেইদিন থেকেই আমার ভয়ের শুরু, বুবু। এই ব্যাপারটা দুনিয়ার কেউ বুঝবে না।

বলতে-বলতে মাসি মায়ের কোলে মুখ গুঁজে ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার কড়া নামাজি গলা শোনা যাচ্ছিল। তখনও ঘুমের জড়িমা জড়িয়ে আছে চোখে। কে যেন বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। আমি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলাম। অন্ধকারে দাঁড়ালাম চুপচাপ। মাসিই কাঁদছে। কোথা থেকে খানিকটা আলো মাসির কুণ্ডলী-পাকানো দেহে এসে পৌঁচেছে। মাসি বারান্দায় পড়ে আছে। লুটিয়ে পড়েছে। কী হল আজ? আজ কি অন্যরকম কিছু? বাবার নামাজ শেষ হল। বাবা জায়নামাজ গুটিয়ে রাখলেন চাঙ্গারিতে বারান্দার। মায়ের ঘরে এলেন। মাকে বাবার সেই খাদালো নরম তুলোর ভেজা-ভেজা গলায় বললেন—কুলসম। যা হবার হল। কেউ যেন না শোনে। মুখ ফসকে গেছে। তুমি তাবৎ জিন্দেগি এই ঘটনা চেপে থেকো। যদি কখনও ফাঁস হয়, তুমিও রেহায় পাবে না। আগাম এক তালাক তোমায় দিয়ে রাখলাম।

এইটুকু বলেই বাবা নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। মাসি বারান্দায় পড়ে রইলেন। কাঁদতে লাগলেন, অনেক রাতে একলা অন্ধকারে শিরিন কখন এই সংসার ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন, আমরা জানি না।

আট

শিরিনের কোন খবর ছিল না কিছুদিন। বাবা খোঁজ করে জানলেন শিরিন ওঁর বড়ো ভাইয়ের কাছে রয়েছেন। বড়োভাই কোর্টের মুহুরি। ধাত-কড়া মানুষ। হাজীর সাথে বোনের বিয়ে দিয়ে তাঁর কিছু আফশোস ছিল। বাবা ভরসা করে সেখানে যেতে পারলেন না। মাকে পাঠালেন। মা বহু সাধাসাধি করেও শিরিনকে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। মা এসে বাবাকে বললেন—আমাকে কেন পাঠাচ্ছ তুমি ? আমি কী করতে পারি ?

আমি মাকে প্রশ্ন করলাম—শিরিনখালামাকে কেন তুমি অমন করে ফিরিয়ে আনতে চাইছ, মা ?

মা বললেন—তোর বাপের জন্য, মিনু। তুই তো দেখেছিস, তোর বাপ কেমন করছে। মন থেকে তালাক তো উনি দেননি।

আমি বললাম—মন থেকে তালাক কজনই বা দেয় ?

মা বললেন—ওটাই পুরুষের ধর্ম।

বললাম—পুরুষ বোলো না। বলো মুসলমানের দাপ।

মা চুপ করে রইলেন। বাবা মাকে আবার পাঠালেন বউতলির রজব মুহুরির কাছে। মা বিরস মুখে ফিরলেন। অসহায় শিশুর মতন বাবা একটা মন-পাগলামির আব্দার ধরে মায়ের আঁচলের তলায় ফিরতে লাগলেন। দুজন পাশাপাশি বসে কেবলই মনস্তাপ করছেন বলে মনে হত। দেখতে-দেখতে একটা বছর গড়িয়ে গেল। আমি মাধ্যমিকের ফাইনাল দেবার জন্য শহরের বাড়িতে এলাম। মাকেও সাথে বেঁধে আনলাম। মা দিনে-দিনে কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। পরীক্ষার সময়টায় একজন অঙ্কের গৃহশিক্ষক দরকার ছিল। আমার এক শহুরে বন্ধু আমায় একদিন একটা চমৎকার খবর বহে এনে বললে—ঘরে এসে পড়িয়ে যাবে, আমি তোমাকে তেমনি একজন শিক্ষিকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এবং ভদ্রমহিলা মুসলমান। ওঁরা এই শহরে একটি টিউটোরিয়াল হোম খুলেছেন। ওখানকার প্রধান শিক্ষকের নাম সাদিকুল খান। ভালোমানুষ। দারুণ ইংরাজি, ইতিহাস পড়ান। সপ্তাহে তিনদিন করে ছয়দিন দুজনে পড়াবেন। লোকটি একটু খ্যাপাটে গোছের। সে যাই হোক, পড়া নিয়ে কথা। তুমি যদি পড় শিওর ফার্স্ট ডিভিশন পাবে। শহরে সবার মুখে-মুখে নাম। হোমে গিয়েও পড়তে পার। বাড়িতে এলে ফী একটু বেশি, প্রায় দুই-তিন গুণ। তা-ও আগেভাগে না বললে, আসবেন না। আমি চেষ্টা করব ? আমি রোজই তো হোমে যাই।

বন্ধুটিকে মুখে কিছু না বলে চুপচাপ পোশাক পালটে মুখে একটু ক্রীম ঘসে মায়ের কাছে গেলাম। তখন সকাল দশটা বেজে গেছে। বললাম—মা, আমরা একটু সাদিকমামার কাছে যাচ্ছি।

মা তো অবাক। বললেন—সাদিক মামা! কোথায় থাকে ছেলেটা?

—এখানে, এই শহরেই থাকেন। ছেলেমেয়েদের পড়ান। আমি ওর কাছে একটু ইংরোজিটা দেখিয়ে নোব।

—বেশ যাও। ওকে জিয়াফত করে এসো। বলবে, মা ডেকেছে। ওর সাথে পরামর্শ আছে।

শুধালাম—খালামার কথা তুলবে নাকি? ওসব তুলো না।

মা বললেন—বিপদের সময় আত্মীয়ের পরামর্শ নিতে হয়। সাদিক যদি চেষ্টা করে শিরিন ফিরতেও পারে। আমি ওকে বউতলি পাঠাব।

আমার খুব রাগ হচ্ছিল। বন্ধুর সামনে নিজেকে সংযত করে বললাম—যা করবে আমার পরীক্ষার পর করবে। নইলে ফেল করলে আমার দোষ দিও না।

মা বললেন—বেশ-বেশ, তাই হবে। তুমি এখন যাও।

বন্ধুর সাথে রাস্তায় নেমেই মনে হল, মা শিরিনের দুর্বল জায়গাটা বোঝেন। ঘটনার পরিণাম ভাবতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরছিল। বন্ধু পাশে থেকে অবাক গলায় শুধাল—মাস্টারমশাই তোর মামা বুঝি? তোর কী ভাগ্য! ভদ্রলোকের প্রফেসর হওয়া উচিত ছিল।

আমরা একটা রিকশা করে মামার ছোটো বাড়ির কাছাকাছি এসে থামলাম। বন্ধুটি রিকশা থেকে না নেমে বলল—আমি স্যারের সামনে যাব না, মিনু। বকবেন। বাঘের মতন করে চোখ পাকিয়ে বলবেন—রাস্তায় এতক্ষণ খোলামকুচি দিয়ে এককা দোককা খেলছিলে বুঝি? তুমি ভাই একলা যাও, তোমারই তো মামা।

বন্ধু কিছুতেই যেতে চাইল না। রিকশা ছেড়ে দিল। অগত্যা একাই আমি। এক বছরেরও বেশি সময় সাদিকমামা আমাদের জীবনে অনুপস্থিত। ছোটো বাড়ি। পাশে প্রকাণ্ড ডোবা। ডোবার ওপারে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের ওধারে কমার্স কলেজ। তার ঠিক উলটো উত্তরে জলঙ্গী বাস স্ট্যান্ড। একখানা মাত্র ঘর। নীচু ছাদ। প্রাকৃতিক ক্রিয়া কোথায় করেন, স্নান খাওয়া? ঘরে তালা বন্ধ। ফিরে আসছিলাম। এমন সময় দেখি পাকা সড়ক ধ'রে মামা এদিকেই এসে গলিতে ঢুকলেন। পাঁচ মিনিট পর মুখোমুখি। দেখেই সোৎসাহে বললেন—ইউ সুইট লেডি, কাম ফ্রম মুন। গতকাল পূর্ণিমার চাঁদের দিকে চেয়ে তোমায় মনে পড়ছিল। ভালো আছ?

সেই সাদিক মামা। ভীষণ রোমান্টিক ভদ্রলোক। কথায় কথায় যিনি গল্প ফাঁদতে পারেন। যাঁকে আমার ভীষণ ভয়ও করে। অথৈ একটা মানুষ। আমাদের মনে করেন খুকি। এই প্রথম তাঁর মুখে লেডি কথাটা শুনলাম। বুঝলাম, আমি বড়ো হয়েছি। মামা তালা খুললেন। ডাকলেন—এসো। মামার মুখে প্রচুর দাড়ি গজিয়েছে। গোঁফে আচ্ছাদিত মুখ। যেন এক ইংরেজ কবি। দুই চোখ উন্মনা। চোখে এখন চশমা নেই। ছোটো একখানা চৌকি। অতিশয় ছোটো টেবিল। ক্ষুদ্র শেলফ-এ কিছু বই। দেয়ালে ঝুল-লাগা রবীন্দ্রনাথ। বিছানার চাদরটা আধ-ময়লা হয়েছে। দড়িতে জড়ো করে ঝোলানো একটি সাদা জামা আর পানজাবি। চৌকির তলায় একটা টিনের বাকস। একটা স্টোভ। বোঝাই যাচ্ছে, উনি হোটেলে খান। সরকারি রাস্তার ট্যাপ থেকে বালতি করে জল এনে রঙিন মগে স্নান করেন। ·গোলাপি তোয়ালে আর টুথব্রাশ আছে। সাবান-কৌটোয় শস্তা সাবান। সিনেমাতারকাদের প্রিয়। ব্যস। এই হচ্ছে একটি মানুষের আস্তানা। এত বড়ো মানুষটার এই হাল! কখনও জীবনে চাকরির চেষ্টা করলেন না। রাজনীতি করেন এমনই যে সেই রাজনীতি জীবনে কখনও তাঁর প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না। প্রতিষ্ঠা মানে, চাকরি বাকরি ইত্যাদি। চৌকিতে বসে বললাম—আমি আমার বন্ধুর কাছে খবর পেয়ে আপনার কাছে এলাম। সামনে আমার পরীক্ষা। আমায় ইংরাজিটা একটু দেখিয়ে দেবেন? শুনলাম, আপনার হোমে একজন মুসলিম শিক্ষিকা ভালো অঙ্ক করান। একটু বলে দিন না, উনি আমায় পড়িয়ে আসবেন। তারপরেই বললাম—আপনি কেমন আছেন?

উনি বললেন—আই অ্যাম অলওয়েজ ইন ফ্রেবার। চায়ের অনুষঙ্গে মেশানো এই ইংরাজি তাঁর নিজস্ব। একটু থেমে বললেন—তোমাদের দেখতে পাই না, এই যা দুঃখ।

শুধালাম—আপনি আর গাঁয়ে যান না কেন?

—সময় হয় না। তা ছাড়া হোমটা চালাচ্ছি। চারজন শিক্ষক। সবাই আমার মতন আঁটকুঁড়ে হতভাগ্য। আমার আরো ছাত্রছাত্রী দরকার। সব স্টুডেন্টদের বলছি, ওরা ওদের বন্ধুদের আমার হোমে নিয়ে আসুক। বেশ, তুমি পড়বে বই কি। আমি সময় পাব না। পড়তে হলে হোমে আসতে হবে। তবে মহিলাটি তোমার বাড়িতে গিয়েই পড়িয়ে আসবে।

—আপনি না পড়ান, মায়ের কাছে একবার দেখা করতে...

—হ্যাঁ। অবশ্যই। যাব। উনি কি এখানেই আছেন?

—আমাদের এখানেই বোধহয় পারমানেনট থাকতে হবে। গোলোকবাবুরা

যাচ্ছেতাই করছে। বাচ্চা-বাচ্চা হিন্দু ছেলেদের ট্রেনিং দিচ্ছে। সকাল বেলা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল করে যায়। বাবাও খুব ভয় পাচ্ছেন। আমাদের শহরে এসে থাকাই ভালো। অন্তত কিছুদিন।

সাদিকমামা বললেন—তোমরা শিরিনের কোনো খোঁজ নিয়েছিলে?

—নিয়েছি। মা শিরিনকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। উনি আসেন নি।

—তোমরা ওকে ফিরিয়ে আনতে চাইছ কেন?

—আব্বাজী চাইছেন, শিরিন ফিরে আসুক।

—কেন?

বলেই মামা কেমন একধারা হেসে ফেলে বললেন—বুঝেছি। কিন্তু ও-যদি সত্যিই না ফেরে, তোমরা কী করবে?

আমি বললাম—না ফেরাই উচিত। কলাগাছ একবার কেটে ফেললে, তাতে আর কোনো কাজ হয় না। নতুন করে ট্যাঁক গজাতে হয়। মা বলেন, মেয়েরা কলাগাছ। ঠিকই বলেন। তবু কেন যে মা…

—বলো।

—না। থাক। আপনি একবার মায়ের সাথে দেখা করুন। যাচ্ছেন তো? মা আপনাকে আজ রাতে নেমন্তন্ন করেছেন।

—আজ?

—কেন? কোনো প্রোগ্রাম?

—না। ঠিক আছে। যাব। —আমি তবে উঠছি।

—হ্যাঁ। এসো।

আমি চলে এলাম। সন্ধ্যায় সাদিকুল এলেন। মা ওঁকে চানা মাখিয়ে মুড়ি আর তেলেভাজা বড়ো বাটিতে এগিয়ে দিয়ে বললেন—তোমার সাথে আমার বড্ড জরুরি দরকার, সাদিক।

মামা বললেন—জানি।

মা বললেন—জানবে বৈকি। শুনেছি, ওই তালাক শুনলে নবীর রেহেল কেঁপে যেত। আল্লার আরশ কুর্সি (সিংহাসন), সাত তবক (স্তর) আশমান থরথর করে কেঁপে যায় ভাই রে। তবু বে-আক্কেলে বুড়ো ওই নোংরা কথা মুখে আনলে। ওকে তোমরা ক্ষমা করে দাও।

মামা মুড়ি চিবিয়ে যাচ্ছিলেন। দ্রুত চিবিয়ে ফেলে জল খেলেন। সব মুড়ি খেলেন না। বললেন—চা খাব, বুবু।

মা বললেন—চা হচ্ছে তোমার জন্যে। আগে একগেলাস দুধ আর মণ্ডা খাও। সাগরপাড়ার মণ্ডা। তুমি আমার অতিথি। মেহমান।

—উদ্দেশ্য ?

হঠাৎ মামার কথা আমিও বুঝতে পারলাম না। মামা তখন ভেঙে বললেন—এত মেহমানি আদরের বহর কেন বুবু ? রফা ? আপস-রফা ? ওকালতি ? আমি শিরিনকে বুঝিয়ে তোমার সংসারে ফিরিয়ে দেব ? আমি ফিরিয়ে দিতে পারি, এটা তোমার মনে হচ্ছে কেন ?

মা ঠাণ্ডা গলাতেই বললেন—কেন মনে হচ্ছে, সেটা মনেই থাক সাদিক। ভেঙো না। আমি সবকিছুর সাক্ষী। আমি তো ছেলেমানুষ নই। বিদ্যে নেই। কিন্তু বুদ্ধি তো ছিল, ভাই।

মামা মণ্ডা খেতে-খেতে বললেন—কিন্তু সবই তো একজনের ব্যক্তিগত অভিরুচি, পারসোনাল অ্যাফেয়ার, ডিসিশন, বুবু। ও এই শহরেই আছে। ওকেই কনভিন্স কর না কেন। আমি আজই ওর সাথে দেখা করে ওকে তোমার কথা বলে দিচ্ছি।...বুবু বুঝবেন কিনা সেদিকে কোনো খেয়ালই ছিল না। ইংরাজি মিশিয়ে, বলার ঝোঁকে বলে, মামা তাঁর কথাগুলো শেষ করলেন। তখন শিরিনখালামা এই শহরেই আছেন শুনে মা আমার চোখে কেমন রহস্য করে তাকালেন।

মা বললেন—আমি কী বোঝাব ওকে ? তুমিই বোঝাও। তোমার কথা বুঝবে। আমি বুঝিয়ে পারি নি। আমি কি শিরিনকে বড়োবোনের ভালোবাসা দিইনি, সাদিক ? আমার কি কোনো দাম নেই ? তুমিই ওর সব হলে ? এতদিনের সংসার কিছু না ? সংসারে থাকতে গেলে অমন একটু হয়ই। বুড়ো তো ওকে তালাক দিতে চায়নি। বুড়োর হাল একবার চোখে দেখবে না তুমি ?

মামা দুধের সাথে মণ্ডা শেষ করলেন। তারপর জল খেলেন আরো এক গেলাস। আমি এনে দিলাম। রুমালে কষ রগড়ে পকেটে রাখলেন। বললেন—কথাটা সেখানে নয়, বুবু। তালাক হাজী দিতে চাননি। কেন দিতে চাইবেন ? তালাকটা শিরিনের বড়ো প্রয়োজন ছিল ?

—কী বললে, প্রয়োজন ছিল ?

—ছিল না ? নিশ্চয় ছিল। তোমাদের খুদা ওকে আশীর্বাদ করেছেন। রাত্রে যেদিন পালিয়ে আমার কাছে এল। তার সেদিন বড়ো সুখের রাত্রি। তাবৎ দিন কী আশ্চর্য ঘুমিয়ে রইল মেয়েটা। তবু তোমার খাতির, সব ওকে বলব।

মা রাগত গলায় বললেন—কে কাকে খাতির করছে, বাছা। তুমি তোমার আপন তালে বলে চলেছ। সবই তোমার বইয়ের ভাষা, নিজের ভাষা বলতে পার না ? গোদা বাঙলায় বলো, তালাকের প্রয়োজন ছিল না। ছিল তোমার। ওই চাহিদা তুমিই ওর মধ্যে খাড়া করেছ। গল্প পেলে দিন সারি, পালকি মেরে করব

ফিকিরি। তোমার ফিকির কেউ ধরতে পারত না, মনে কর ? আমার আর হাজীর স্নেহ তোমায় খাল কাটতে সুযোগ দিয়েছে। তার প্রতিদান দিলে এইরকম। ছিঃ ছিঃ, ভাবতেও ঘেন্না হয় !

—আহ্ মা ! তুমি এসব কী বলছ ? চুপ করো। আমি আর সইতে পারছিলাম না। মা কিন্তু থামতে চাইলেন না। বললেন—ঠিকই বলছি, মিনু। ওই ছেলে সব সর্বনাশের মূল। কত ঘরের বউয়ের চোখের পানি ঝরিয়েছে আমি জানি না ? ছেলেবেলা থেকে ওর সব ইতিহাস মুখস্ত। বরাবর ওর বিয়ে-হওয়া মেয়েদের দিকে লোভ। একবার বড়ো বাড়ির ছোটো বউকে নিয়ে ছেলেবেলায় কী কেলেঙ্কারি না করেছে। আমিই সব নিরস্ত করেছি। এবারও শিরিনকে তোমায় ফেরত দিতে হবে। মেয়েদের চোখে যত পানি ফেলেছ তুমি, সব একদিন ওই দুইচোখ দিয়ে ঝরাতে হবে। কেন, তুমি একটা কুমারী মেয়েকে প্রেম করতে পার না ? সেটা বুঝি রোচে না তোমার ? চরিত্রহীন ছেলে !

সাদিকুল আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। মাকে কোনো কথা না বলে আমার হাত ধরে টানলেন। বললেন—আয়। আয় মিনু। তোর সামনেই কথা হবে। মামার গলা কাঁপছিল।

—না। না। সে কী ! আমি অস্ফুট গলায় মায়ের চোখে চাইলাম। মায়ের চোখে সন্ধ্যার আলো পড়ে চকচক করছিল। মা চোখের ইশারায় সাদিকুলের সাথে যেতে বললেন। মামা এক ঝটকায় আমায় রাস্তায় টেনে এনে ফেললেন। রিকশা করলেন দ্রুত। উঠে পড়লাম। প্রায় বিশ মিনিট পর একটি গলিতে রিকশা ঢুকল। আমি চিনতে পারলাম, বাড়িটা আমাদেরই, মাড়োয়ারি পরিবার থাকত। দোতালায় উঠে কলিং বেল টিপলেন মামা। শিরিন ঘর থেকে সাড়া দিলেন—এসো। এতক্ষণে সময় হল বুঝি ! তুমি কিন্তু নিজেই দুখানা টিকিট করেছিলে, ছবিখানা মন্দ ছিল না। এলে না দেখে···

সিনেমার কথা বলছিলেন শিরিন। কথা থেমে গেল। আমরা ঘরে ঢুকে পড়েছি। আমায় দেখে ভূত দেখার ভয়। মুখ শুকিয়ে গেল। অস্ফুট বললেন—তুমি এসেছ ! রিকশায় কোন কথা বলেন নি মামা। চুপচাপ গম্ভীর ছিলেন। শিরিন একখানা শাড়ি ভাঁজ করছিলেন। সেটা আলনায় রেখে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। বুঝলাম, আমায় দেখে খুশি হননি। মামা একটি চেয়ারে বসে আমায় খাটে বসবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর বললেন—দেখো মিনু, প্রবলেমটা আমাদের সবার। তুমিও কথা বলবে। মানে কনভিনস করবে। তবে তুমি বিশ্বাস করতে পার, আমি তোমার খালামার কোনো ক্ষতি করিনি। ও নিজেই এই বাড়িতে এসেছে। আমি ওর দুটি অন্নের ব্যবস্থার জন্য হোমে অঙ্কের

মাস্টারি দিয়েছি। তোমাকে কাল থেকেই পড়াতে যাবে। ও তো তোমাদেরই। তবে তোমাকে আমি আমার দোষের কথাও বলব একদিন। আমি কুমারী মেয়েদের প্রেম করতে পারি না, কিন্তু শ্রদ্ধা তো চাই। ইউ হ্যাভ কাম ফ্রম মুন। তোমরা রুপালি মানবী। চন্দ্রলোকের কুসুম। তাই কিনা ?

বলেই সাদিকুল আপন মনে হাসতে লাগলেন। শিরিন ঢুকলেন ঘরে। শুধালেন—তোমরা ভালো আছ মিনু ?

বললাম—আব্বাজীর বুকের হাঁফটা বেড়েছে ?

মামা বললেন—ওরা তোমায় আকাশ-পাতাল খুঁজছে, শিরিন। তাই মিনুকে নিয়ে এসেছি।

—কেন ? আমায় খোঁজার কী আছে !

মামা বললেন—কাল থেকে মিনুকে অঙ্ক শেখাতে যাবে। বুবুও এসেছেন। বড্ড কান্নাকাটি করছেন। তোমায় যে কী ভালোবাসেন...

শিরিন ফোঁস করে উঠলেন—মিছে কথা। একদম মিছে কথা। ভালোবেসে যে লোক মানুষকে খানিক নোংরা বিষ্ঠা এগিয়ে দেয়, তার ভালোবাসাকে কী নাম দেবে ? আমার কষ্টের কথা সবচেয়ে ভালো করে তাকেই বলেছি আমি। সেকথা তুমিও জান না। তারপরেও সে আমায় বোঝাতে আসে পাঁকের নাম পদ্মফুল। সবচেয়ে ঘৃণার কথা কী জান ? বুড়ো ওকে তালাকের ভয় দেখিয়ে আমার কাছে পাঠাচ্ছে, আর ও দিব্যি চলে আসে আমার হাত ধরতে ! ওর বহিনগিরি অসহ্য।

আবার শিরিন এ ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। বোধহয় রান্নাঘরে। খুব চমৎকার করে সাজানো এই ঘর। প্রশস্ত খাট। ভারি তোশক। ধপধপে বিছানার চাদর। সুন্দর টেবিল। প্রকাণ্ড দামি কাঠের আলমারি। সোফা। চেয়ার। সব আছে। সব পালিশকরা। মেঝেয় মোজায়েক। মাড়োয়ারি খুব পয়সা ঢেলে গড়েছিল। মাসিক ভাড়া থেকে তৈরির খরচ কাটানো হচ্ছিল। নিদেন এই বাড়িতে ওরা ভাড়া না দিয়ে পনের-বিশ বছর থাকতে পারত। যাই হোক, এখন সেই বাড়ি সম্পূর্ণ খালামা শিরিনের। আমাদের এই বাড়িতে কোনো অধিকার নেই। এখানে জীবনকে নিয়ে গুছিয়ে বসা যায়। শিরিনের চোখে জীবনের সেই ইচ্ছে দানা বেঁধে গেছে। মাসি একদিন কথায়-কথায় বলেছিলেন—কোনো মেয়েই বোধহয় আবদুল মাঝি টাইপের বরের স্বপ্ন দেখে না। ছুঁচলো তার দাড়ি। গোঁফ তার কামানো। মাথা তার নেড়া। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। রবি ঠাকুরের ইলিশ আর কচ্ছপের ডিম ধরা আবদুলের গল্প। পদ্মার মাঝি আবদুল। তোমার বাপকে দেখে আমার সেই আবদুল মাঝির আদল মনে পড়ে। তুমি কখনও জীবনে এমন বরের স্বপ্ন দেখতে পার মিনু ?

কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। খুব তন্ময় হয়ে শিরিন-খালামায়ের বরের গল্প শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ মামার কথায় অন্যমনস্কতা নষ্ট হয়ে গেল। সম্বিত পেয়ে শুনলাম, শুনলাম মামা বলছেন—দেখলে মিনু, কেমন অবুঝ হয়ে গেছে। ও ভয় করছে, আমিও বুঝি কখন ওর শত্রুতা করব।

আমি বললাম—আমার হঠাৎ করে এখানে আসা ঠিক হয়নি সাদিকমামা। আমায় আপনি রিকশায় তুলে দিন। আমি চলে যাই।

সাদিকুল কিছুক্ষণ চুপ করে হাতের নখ খুঁটতে থাকলেন। ঘাড় গোঁজ করে রইলেন। দু-একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন অন্যমনস্ক। গভীর চিন্তা করছেন উনি। হঠাৎ বলে উঠলেন—আমার একটা দোষের জায়গা আছে। আমি শিরিনকে প্রলুব্ধ করেছি। কেন করেছি, সেটা তোমায় বলব, মিনু। একদিন নিশ্চয় জানতে পারবে। আমি চরিত্রহীন, কথাটা একদম মিথ্যে নয়। আমার পারভারশন আছে। একটা খুব নীচু রুচির প্রবৃত্তি আছে আমার মধ্যে। আমি অসুস্থ।

কথা শুনে আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম। দেখলাম, উনি মায়ের কথায় ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন। বললাম—এভাবে বলছেন কেন ? আপনার দোষ কী ছিল ? খালামাকে সাহস দিয়ে একটা পাঁক থেকে তুলে আনলেন। মানুষকে সেল্ফ দেয়া তো অন্যায় নয়। তাছাড়া, শুধু সেকারণেই খালামা এখানে এসেছেন, তা-ও নয়। খালামার আজকের জীবন দৈব-লব্ধ ব্যাপার। যাকে ইরাজিতে গড-গিফটেড বলে। আপনি একদিন এইরকম একটা গল্প বলেছিলেন আমাদের। ছাতের ওপর মাদুর বিছিয়ে সেই গল্প আমরা শুনেছি।

মামা খুশি হয়ে বললেন—তোমার মনে আছে ? নাউ ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। আমি এই জীবন-এর সপক্ষে এতদিন একটা স্ট্রং যুক্তি খুঁজছিলাম। গল্পটা মনেই ছিল না। সেই রাজকুমারীর গল্পটা, তাই তো ?

শিরিন আবার এলেন। বললেন—দুজনে চোরের মতন কথা বলছ কেন ? আমরা কারো ঘরে সিঁদ করিনি।

মামা মাসিকে মৃদু ধমক দিয়ে উঠলেন—তুমি এত উত্তেজিত হও কেন ? সমস্যা অনেক গভীর। লঘু করে দেখা ঠিক নয়। বুবুর ধারণা, আমি, কেবল আমিই তোমাকে হাজীর সংসারে ফেরত পাঠাতে পারি।

—পার নাকি ?

—বুবু বলছেন।

—বুবু যা খুশি বলুন। তুমি নিজে কী বলছ ? তাড়িয়ে দেবে ? ভিখিরি করে দেবে ? এখন দেখছি, কথা ছাড়া সত্যিই তুমি কিছুই পার না। আমি জানতাম,

বুবু তোমায় প্রেসার দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইবে। বলি নি তোমায় ? এতদিনেও কোর্টে মামলাটা তুমি করলে না। আমি ওই বুবুকে আদালতে তুলব। আমার একমাত্র সাক্ষী ও। জীবনের পুরোটাই বাজি ধরেছি, সাদিক। শুধু তোমার মুখের কথায় ভুলিনি। একজন মেয়ে, একজন মেয়ের জন্য কতখানি করে, মিনু তুমি বুবুকে বলবে, সাধের বোন, পরানের পরান, বলবে বুবুকে, আমি সেই বোনের কাছে দাবি করছি, আমার আপীল, বুবু কোর্টে সত্য কথা বলুক। একটি মেয়ে, অবলা, আর-একজন জীবন-অভিজ্ঞ মেয়ের কাছে, জীবনের মুক্তি চাইছে। বুবুই আমার আদালত। হ্যাঁ সাদিক, আমি সেই আগ্নেয় জীবনপিণ্ড। দাহ ছাড়া কিছুই নেই আমার।

বলতে-বলতে শিরিনের বোধহয় মাথা ঘুরে উঠল। ধপ করে উনি সোফায় ঢলে পড়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—তোমায় বলি। প্রার্থনা করি, কারুকে বলে দিও না, আমার বিদ্যে নেই। স্কুল ফাইনাল পাশ-করা টীচার। হোমের ছাত্র-ছাত্রী কমে যাবে। দুমুঠো অন্ন পাই। আমাদের ভাতে মেরো না, মিনু। বলে উনি ক্লান্ত হয়ে চোখ বুঁজলেন।

আমার প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পারছিলাম না। মাসির গা ছুঁয়ে বললাম—আমি তোমার বন্ধু ছিলাম খালামা। হয়তো কখনও কোনো ব্যাপারে তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করেছি, নিজে কখনও অনিষ্ট করিনি।

মাসি হঠাৎ আমার হাত দুখানি জড়িয়ে পাগলের মতন ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চুপ-চাপ সেই কান্না গলে-গলে ঝরল। মাসি একসময় চুপ করলে আমি বললাম—আমি যাচ্ছি, খালামা।

মাসি মুখ তুললেন। বললেন—যাবে ? আমি একলা থাকি। রোজ যদি একবার এসে দেখা দাও, আমার মন ভালো থাকে। এখানে এলে আমি তোমায় পড়াতে পারি। বুবুর কাছে কখনও যাব না, মিনু। যেতে বোলো না।

আমি উঠে পড়লাম। সাদিকুল কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

রাস্তায় নেমে রিকশা ডাকলেন। আমি রিকশায় উঠে পড়লাম। মামা সহসা বলে উঠলেন—আমার কথার ধার পড়ে গেছে। শিরিন নিজের মনের মতন চিন্তা করতে শিখেছে। বলেই উনি রিকশায় আমার পাশে উঠে বসলেন। রিকশা চলতে শুরু করলে বললেন—সামনেই আমি নেমে যাব। তারপর পথে-পথে অনেক রাত অব্দি একলা ঘুরে বেড়াব। পার্টি অফিস যাব একবার। রাত্রে আমি অন্ধকারের তরঙ্গ দেখতে পাই। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একদিন অন্ধকার ভালো লাগে। শ্রীকান্ত পড়েছ ?

—হ্যাঁ।

—প্রথম পর্বের গোড়ার দিকেই কোথাও এক জায়গায় শ্রীকান্ত কবিত্ব সম্পর্কে জোর অনীহা দেখিয়ে বলছে, শ্রীকান্ত লোকটি কবিত্বের বাষ্পশূন্য একজন খাঁটি গদ্যের মতন শুকনো মানুষ। পোড়া চোখে গাছকে গাছ দেখে, পাথরকে পাথরই দেখে। মেঘকে মেঘই মনে হয় তার। মেঘের দিকে চেয়ে থেকে ঘাড় ব্যথা করে ফেলেছে, মেয়েদের মাথার একরতি চুল অব্দি দেখতে পায়নি। চাঁদের মধ্যে প্রিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হযনি। বড়ো বেড়ে বলেছেন শরৎবাবু। আবার সেই লোকই জীবনে একদিন শ্মশানে গিয়ে অন্ধকারের রূপ দেখে মুগ্ধ। এই দেখতে পাওয়াটাও জীবনে সব সময় হয় না। আমি যেমন অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ খুঁজে পাই না।

—সে কী! কেন?

—ওটাই আমার দোষ, মিনু। একদিন সব বলব। কিন্তু শিরিন তেমনি এক অন্ধকার। অবধি নেই। শেষ নেই। বড্ড অবাক করে দুই চোখ টেনে রাখে।

মামা চুপ করে রইলেন। খানিক বাদে আমিও কেমন নিজেকে কোথায় নিঃসঙ্গ এক ভাবনার আবর্তে হারিয়ে ফেলেছিলাম। রিকশা কি থেমে ছিল? হঠাৎ পাশে দেখি মামা নেই। অন্ধকারে কোথায় মিশে গেছেন। বাঁ হাতে মামাব সেই বিশাল অন্ধকার মাঠ খাঁ খাঁ করছে। এই অন্ধকারে একলা চলতে-চলতে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল আমার। আবিষ্কার করলাম, আমি কাঁদছি। খুব গোপন এক আকুলতা আমায় কাঁদাচ্ছে।

নয়

বলাই বাহুল্য, আমি পরীক্ষা ভালো দিতে পারিনি। পরীক্ষার পর মা গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। আমিও শহরে একা। ঘরে একজন রান্নার মেয়ে ছাড়া কেউ নেই। শহরের এক লাইব্রেরির মেমবার হয়ে গেলাম। সেখানেই একদিন মাসির সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। মাসি বা সাদিক কারো সাথেই উপরের ঘটনার পর দেখা করিনি। ওঁরাও কেউ আমার খোঁজ করেননি। মাসিকে বললাম—তোমার সাথে দেখা করিনি বলেই যেটুকু হবার হল, ভালোমন্দ একরকম। নইলে সেটুকুও যেত। আমি পরীক্ষার কথা বলছি। এইভাবেই সেদিন মাসির সাথে কথা শুরু হল। মাসি একখানা নতুন প্রকাশিত উপন্যাস ইস্যু করিয়ে আমার হাত ধরে বললেন—তুমি বই নিয়েছ? চলো একটু দুজনে ঘুরব। বলে লাইব্রেরির করিডোর ডিঙিয়ে রিকশায় জটলার চৌমাথায় এসে থামলেন মাসি। মাসিকে জীবনানন্দের কবিতার কোনো এক নায়িকার

মতন করুণ উজ্জ্বল রূপসী মনে হচ্ছিল, এবং গোধূলি মদির। সূর্য তখন ডুবুডুবু। আমরা এক মনোহারি দোকানে এসে থামলাম। মাসি তার নির্দিষ্ট প্রিয় সেন্ট আর সাবান কিনলেন। তারপর মিষ্টি করে হেসে বললেন—মেয়েরা যখন রোজগার করে সেই পয়সায় নিজের প্রিয় জিনিস কেনে, তখন তার রোমাঞ্চ আলাদা। আমি কিছু পয়সা জমাচ্ছি, বুঝলে ? সেই পয়সায় একটুকরো মাটি কিনব। ঘর করব।

—কেন, সাদিকমামা ?

—ওর কথা বাদ দাও। তোমাদের মেড়োর বাড়িতে তো চিরকাল থাকা যাবে না।

—ওটা তোমারই বাড়ি।

—কে বলেছে আমার বাড়ি ! যে হাজী ঐ বাড়ি আমায় দিয়েছে, সেই হাজী তো আমার নেই। অতএব ওই বাড়িও ঠিক আমার নয়। ওই বাড়িতে বেশি দিন থাকলে, তোমাদের খোঁটা লাগবে। আমি চাই না।

হাসতে-হাসতেই বললাম—তুমি বেশ মেয়ে !

—কেন ? এতে বাহবার কী আছে, যা সত্যি তাই বললাম।

আমি কোনো কথা না বলে মাসিকে রিকশায় ফেরার পথে বারবার চোখের কোণে দেখতে থাকলাম। শেষে প্রস্তাব করলাম—মা নেই। বাড়ি ফাঁকা। চলো ওখানে গিয়ে খানিক আড্ডা মেরে তোমার বাড়ি চলে যাব দুজনে।

—যাবে ?

—নিশ্চয় যাব। যাব না কেন ?

—আমার কাছে রাতে থাকবে ?

—থাকব বৈকি !

—কথা দিচ্ছ ?

—হ্যাঁ।

আমরা রিকশা থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকে কাজের মেয়েটিকে বললাম—রাতে একা থাকতে হবে। দরজা এঁটে কষে ঘুম দেবে। আমি খালামার কাছে যাচ্ছি। সন্ধ্যার পর আমরা বেরিয়ে যাব।

মাসিকে বললাম—মা নারকোলনাড়ু করে রেখে গেছে। মুড়ি দিয়ে খাবে ? টাটকা সরষের তেল আছে। মাখিয়ে আনব ?

মাসি ঈষৎ কড়া হয়ে বললেন—না থাক। আমি শুধু কফি খাব। তুমি কফি ভালোবাস বলে চাইছি। নিজে হাতে করে দিতে হবে।

—এই গরমে কফি ঠিক জমে না।

—গরম কোথায় ? শীত এখনও যাই-যাই করছে, যাচ্ছে না।

—নাইস বলেছ। তবে তাই হোক। বলে আমি কফি বানাতে গেছি, এমন সময় বাবার কণ্ঠস্বর। বুক হিম হয়ে গেল। মাসিকে এখানে এনে কী ভুল করেছি আমি ? মাসি আমায় হয়তো ভুল বুঝবেন। কাজের মেয়েটাকে বানাতে বলে বাইরে এলাম। দেখি দেয়ালে পাঁচখানা সাইকেল। ক্যারিয়ারে বেডিং বাঁধা। ওরা পাঁচজন উঠে এলেন। পাঁচজনই লীগের লোক রাজনীতিতে, ধর্মে বিশেষ জামাত করেন। তবলীগ করে বেড়ান। বেশির ভাগ সময় সাইকেল করে ঘোরেন। রাত্রে এখানে থাকবেন বোঝাই যাচ্ছে। প্রত্যেকে মুসলমানি পোশাক পরেছেন। চুস্ত আর কলিদার। গলায় জড়ানো লম্বা রুমাল। মক্কা-মদিনার ছাপ। মাথায় গোল টুপি। মুখে কারো কাঁচাপাকা দাড়ি। কারো ভীষণ কালো সুন্নত।

—দুজনের মধ্যে কোন্‌টা আপনার ছোট গিন্নি ? প্রশ্ন একজনের।

মাসিকে দেখালেন বাবা। দ্বিতীয় জনের মন্তব্য—এ তো বাড়িতেই রয়েছে দেখছি। পালিয়ে গেছে বলছিলেন ?

বাবা বললেন—পালিয়ে আর যাবে কোথায় ! একটু বিরাগ মতন হয়েছে। আপনারা দোয়া করুন। ভালো-ভালোয় সুমতি করে উনি যেন কালই বাড়ি ফেরেন। আমার সংসার উরাল যাচ্ছে বড়েমিঞা। কালই সবাই মিলে কিসের যেন হোম হয়েছে, ওখানে গিয়ে মাস্টারদের মেহেরবানি চাইব। আর্জি করব। কী বলেন ? একটু থেমে, এই হচ্ছে আমার একমাত্র মেয়ে মনোয়ারা, ডাক নাম মিনু। বললেন বাবা। বললেন—আমার প্রথম তিন ছেলে মারা গেছে হঠাৎ-হঠাৎ। এক মেয়ে, সে-ও গেছে কলেরায়। তারপর এই মেয়ে। পরের দুই ছেলে বাড়িতে দেখলেন। এই আমার একমুঠো সংসার। কেন যে আলগা হয়ে গেল। সবই খোদার মর্জি। এবার শিরিন, তোমাকে ঘরে ফিরতে হবে।

কাজের মেয়েটি কফি এনেছিল। ভেবেছিলাম, মাসি খাবেন না। কিন্তু দিব্যি খেয়ে যেতে লাগলেন চুপচাপ। নিংড়ে খেয়ে টেবিলে কাপ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। আমায় বললেন, চললাম মিনু। কাল দেখা করো।

মাসি একবারও পেছনে ঘুরে চাইলেন না। অন্ধকারে রিকশার ঘন্টি দ্রুত রাস্তায় চলে গেল মিলিয়ে যেতে-যেতে। আমি বললাম হোমে যাবেন কেন আপনারা ?

—কেন যাব, সে কৈফিয়ত তোমাকে দিতে হবে নাকি ? যা ভালো বুঝছি, আমরা করছি। তুমি চুপ করে থাকো। বাবা গর্জন করলেন। রাত্রে আর কোনো কথা হল না।

খুব সকালেই ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। রাতে ওঁদের কী যুক্তি হয়েছিল জানি না, সেদিন ওঁরা হোমে না গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলেন। সাতদিন পর টিউটোরিয়াল হোমের সামনে পাঁচ মুরুব্বির উদয়। তখন ক্লাস চলছে। অঙ্ক কষাচ্ছিলেন মাসি। বোর্ডে হাতে ধরা চক ভেঙে পড়ল। মাসির সমস্ত চেতনা থরথর করে কেঁপে উঠল। ওঁদের দেখে ছাত্রছাত্রী অধিকাংশ হিন্দু, প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল।

সাদিক বললেন—কী চাই আপনাদের ?

একজন বললেন—আমরা আমাদের মেয়ে চাই। ঘরের বউ চাই। তুমি ওকে ছিনিয়ে এনে রাস্তায় ব্যবসা খুলেছ। একটা অর্ধ শিক্ষিত মেয়েকে ফুঁসলে এনে ভালো-ভালো ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছ তুমি। বেইমান। চোর। নির্লজ্জ। এ কেমন পণ্ডিতি তোমার সাদিক ? ওই অবস্থাতেই মাসি চৈতন্য হারিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়লেন। সাদিক নির্বাক। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে। দুটি ঠোঁট কেবল থরথর করে কাঁপছিল। মাসি সেই থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হোমে যেতে পারলেন না। ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হঠাৎ দ্রুত বন্যার জলের মতন কমে গেল। ফেরার পথে লীগের রাজনীতি-করা শহুরে মোল্লা মৌলানাদের চাউর করে গেলেন, ওই হোম অপবিত্র হয়ে গেছে। ফলে মুসলিম ছেলের সংখ্যা আরো কমে গেল। মাসি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছাত্রদের মধ্যে সাদিক সম্পর্কে যে প্রবল শ্রদ্ধা ছিল, তা কিছুটা নষ্ট হয়েছিল এই ঘটনায়। কিন্তু প্রকৃত আঘাত এল অন্যদিক থেকে। আরো দুইজন যে শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা হিন্দু। কুন্তল রায় আর জনার্দন সেনগুপ্ত। হোমের বাড়িটা ছিল জনার্দনের। জনার্দন সহসা বেঁকে বসলেন। বললেন—আমরা আরো কোয়ালিফায়েড টীচার পাচ্ছি, সাদিক। শিরিন অঙ্কেও খুব ভুল করেন। তা ছাড়া মুসলিম মেয়ে বলে দেখলে তো, কী কাণ্ড হয়ে গেল। ঘরের বউ ঘরে ফিরে যাক।

একটু থামলেন জনার্দন। বললেন—এটা গোঁড়া মুসলিম এলাকা, অথচ মুসলিম ছেলে বরাবরই কম। শিরিন আসার পর সেই সংখ্যা আরো কমে গেল। ওটা আর উঠবে না। রুটিমহলের ওদিকে জমিদারপট্টি। প্রচণ্ড গোঁড়া সব। লীগকে ভোট দেয়। আমি ওদের বোঝাতে পারছি না, ভাই। ওরা কখনও এই রকম হোমে মেয়ে টীচারই দেখেনি, তারপর তোমরা মুসলমান। তারপর ঘর-পালানো বউ। টি টি পড়ে গেছে, আমার হোমের বদনাম হয়ে গেল। তুমি থাকো। কারণ তুমিই হোম গড়েছ, শিরিন বরং···

সাদিকুল ম্লান হেসে বললেন—তোমারও সংস্কার কম নয়, জনার্দন। যাকে টীচার করে আনতে চাইছ, সে-ও কিন্তু লেডি। তোমার এক পরিচিতা। তাই

নয় ? হিন্দু হলে, ওইরকম ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে না। তুমি ভালো করেই জান, হাজীর সাথে শিরিনের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ঘটনা হিন্দুর হলে, শিরিনের পক্ষেই ছাত্রছাত্রী অভিভাবকের সহানুভূতি পাওয়া যেত। হাজীর জবরদস্তিকে তুমি ঘৃণা করবে ভেবেছিলাম। কিন্তু এটা তোমারই মধ্যে সংস্কার, জনার্দন, ঘরের বউ ঘরে যাবে। মুসলমানের বউ, হাজীর পত্নী, পরহেজগার। ধম্মে লাগে। তাই না ?

—এসব কথা বলতে পারলে, সাদিক ? আমি অতশত ভেবে বলেনি। আমি হোমটা রক্ষা করতে চাইছি। হোম উঠে যাক, তুমিও চাও না।

অভিমান বাজিয়ে কথা বললেন জনার্দন। তারপর কুন্তলের সমর্থন চাইলেন—তুমি কী বল কুন্তল ?

কুন্তল এতক্ষণে মুখ খুললেন। বললেন—আমি আর কী বলব ? যার হোম সে-ই তো বলছে। যাকে রাখবার রাখবে, ফেলে দেবার হলে ফেলবে। এটা তো গবমেন্ট-রিকগনাইজড চাকরি নয়। তবে আমার কথা হল, মান-ইজ্জতের কোশ্চেন যখন উঠেছে, সব দিক ভেবেই বলছি, সাদিক ভাই, তুমি আর আমাদের মধ্যে থেকো না। রাখতে হলে দুজনকেই রাখতে হবে। শিরিন তো চলে যাবে, ফিরে যাবে বলে আসেনি।

একটু দম ফেলে বললেন কুন্তল—কিন্তু জনার্দন চাইছে, সুচেতা হোমের টীচার হোক। বি· কম· পাশ করেছে, এমন কিছু কোয়ালিফিকেশন নয়। এই সাদিক ডবল এম· এ· সেটা কেন ভুলে যাই ? কোয়ালিফিকেশনের কথা তোল কেন ? একটা সামান্য প্রাইভেট হোম, এখানেও বিদ্যের বহর নিয়ে কথা ? তুমি বলছ, শিরিন অঙ্ক ভুল করে, কোথায় ভুল করে অঙ্ক ? ইলেভেন টুয়েলভ অব্দি ও নির্ভুল অঙ্ক কষায়। ডিগ্রিটাই সব হয়ে গেল তোমার ? আমি এই কূট তর্কে ঢুকতে চাইছিলাম না। সুচেতা আসবে, তার জন্য শিরিনকে যেতে হবে কেন ? ওপরের অঙ্কগুলো সুচেতা করাবে। নীচে থাকবে শিরিন। অ্যাকর্ডিং টু কোয়ালিফিকেশন। সমস্যা ছাত্র। ছাত্র কি বাড়ানো যায় না ? সুচেতা জনার্দনের বন্ধু, বেশ তো বন্ধুর উপকার হোক। সেটাই যখন কথা।

জনার্দন খেপে গেলেন, তবু কেঁপে-কেঁপে বললেন—সেটা কোনো কথা নয়, কুন্তল। কে কার উপকার করে ? আমি অত হীন ইচ্ছে নিয়ে কথা তুলি নি। আমি শুধু হোমটাকে বাঁচাতে চেয়েছি।

পাশের ঘরে কথা হচ্ছিল শিরিনের বাড়িতে। আমরা এ-ঘরে থেকে সবই মোটামুটি জানালা দিয়ে শুনছিলাম। মাসি শুয়ে ছিলেন। ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন। হঠাৎ দুম করে উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমি সভয়ে ওঁর

পিছু-পিছু গেলাম। মাসি বললেন—জনার্দনবাবু, আপনার হোম আপনারই রইল। আমরা আর যাচ্ছি না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে শুনে যান, আমি আসলে এখন কারো বউ নই। আমায় কেউ ছিনিয়ে আনে নি। আমি একাই এসেছি। স্রেফ একা। যান, চলে যান আপনারা। আমি অসুস্থ, একলা থাকতে দিন।

জনার্দন উঠে পড়লেন। কুন্তলও। যাবার সময় কুন্তল শিরিনের কাছে এসে বললেন—যুদ্ধ তো কেবল শুরু, শিরিন। দেখতে চাই সোনাভান কেমন অসি চালায়।

—আমার যুদ্ধ বোধহয় শেষ হয়ে এল, কুন্তল। আমি যে হেরে যাচ্ছি।

কুন্তল বললেন—হারলে তো চলবে না। এই শহরে তোমাদের দুজনকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যেদিন তোমরা বিয়ে করবে, আমি সেদিন আধমন বাতাসা কিনে রাস্তায় ছড়াতে-ছড়াতে যাব। আমার এক মামা, ভালো মোক্তার, ডিভোর্সের মুসাবিদা ভালো করেন। একদিন তুমি আর সাদিক এসো, আমি ব্যবস্থা করে দেব। আজ যাই। পরে আসব আবার। লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না শিরিন। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর দিতে হবে। চলি।

আদালতে মামলা উঠল।

দশ

দুদিন পর মাড়োয়ারির কোথাকার এক ভাগ্নেকে এনে, সেই মাড়োয়ারির চিঠি দেখিয়ে শিরিনমাসিকে রাস্তায় নামিয়ে দিলেন বাবা। যেদিন ওঁকে নামিয়ে দেয়া হল, সেদিন মা আবার এই শহরে ফিরে এলেন। এসেই শুনলেন, মাসি ও-বাড়িতে নেই। মা কথাটা শুনে খুশিই হলেন মনে হল। পৃথিবীর এক নতুন নাটক দেখলাম আমি। মায়ের কি এই ছিল সতীন-বিদ্বেষ? নাকি মানুষের স্বামী-ভক্তির রূপটাই এমন নির্মম?

তারপর তিন মাস কেটে গেছে। আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। কলেজে একাদশ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। জানতাম না, আদালতে মামলা হয়েছে। একদিন বাড়িতে কোর্ট থেকে নোটিশ এল। তার বয়ানে বোঝা গেল, মাকে কোর্টে সাক্ষী দিতে হবে। খালামায়ের একটিই সাক্ষী, একমাত্র বিশ্বাসের ঠাঁই। কিন্তু ওঁদের আমরা আর দেখতে পাই না। শিরিন কিংবা সাদিকুল। কোথায় ওঁরা চলে গেছেন। একদিন হোমে গেলাম। কুন্তল কিছুই বলতে পারলেন না।

দুঃখ করে বললেন—ওই মেয়েটির নাম সুচেতা, মাথায় সিঁদুর। দশ দিন আগে জনার্দন বিয়ে করেছে। বোঝো!

একটু ক্ষণ চুপ করলেন কুন্তল। তারপব বললেন, আমি এই হোমে আর থাকব না। সাদিকুল কোথায় আছে, ঠিক জানতে পারব। মোক্তারমামাও কিছু বলতে পারছেন না। সামনে সাত তারিখ কোর্টের ডেট। তুমি ওইদিন যেও।

—না। আমি গেলে বাবা গলা কেটে ফেলবে। ওর এখন ইজ্জতের সওয়াল। বাবা কোরান হাতে করে লীগের মওলানাদের সামনে কসম খেয়েছে তালাক দেয়নি বলে। গত রাতেও মাকে বলছিল, কুলসম. তোমার হাতে আমার ইজ্জত বাঁধা। কসম খেয়েছি, সেই কসমের মান রেখো। নইলে আমি সংসার জ্বালিয়ে দেব। রাস্তার কুকুর বেড়াল করে দেব। আমি উসমান জমাদারের পোতা। মা ভয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

কুন্তল বললেন—তবে তো 'কেস' ফেভারে আসবে না। শিরিন হেরে যাবে। মুসাবিদায় তোমার মাকে সাক্ষী করে হাজী তালাক দিয়েছে বলা হয়েছে। অতএব শিরিন হারছে। আমি অন্যভাবে 'কেস' তৈরি করতে বলেছিলাম। শিরিন তা কিছুতেই শুনলে না। এখন কী হবে?

—কী হবে, আপনিই বলুন? অসহায় শোনাল আমার গলা।

কুন্তল বললেন—আমি কী বলব, মিনু? বলবেন তোমার মা। যাক গে, এখন কী হয়, দেখো।

বলে কুন্তল সিগারেটের বোঁটা জুতোর তলায় পিষলেন। তারপর অন্যমনস্কের মতন ক্লাসে চলে গেলেন। আমি আর দাঁড়ালাম না।

দিন পনেরো পর হোমে আবার গেলাম। দেখলাম, কুন্তল চাকরি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছেন। মাসিকে জানবার সামান্য শেষ সূত্রও ছিঁড়ে গেল। বুকের ভেতরটা কেমন করে কাঁদত আমার, কাউকে বোঝাতে পারব না। একদিন পার্টি অফিসে গিয়ে খোঁজ করলাম। শুনলাম, সাদিকুল পাটনা গিয়েছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। শিরিনের কথা পার্টির লোকেদের জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ হল। সেদিন আমি ভুল করেছিলাম। ওঁরা শিরিনের খবর জানতেন। এরপর আমার সামনে কেবল মা আর মা। মায়ের চেহারায় বার্ধক্য নেমেছে স্পষ্ট হয়ে হঠাৎ-ই কয়দিনে। মাকে আব্বার পাশে বেমানান লাগত। মনে হত, মা আর্ধেকবয়েসী বউ। স্বামীর বয়স ডবল। শিরিনকে মনে হত আব্বার মেয়ে। কিন্তু মা এত বুড়িয়ে গেলেন কেন? বিকাল হলে মা একটা রিকশা করে আমায় সাথে নিতেন। মায়ের চোখে চেয়ে বুঝতাম উনি

যেতে-যেতে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে কাকে যেন খুঁজছেন। একদিন ভিড়ের মধ্যে কাকে দেখে মা 'শিরিন' 'শিরিন' বলে চিৎকার করে উঠলেন। সত্যিই তো। শিরিন-মাসি। ভুল করে রিকশা চলার বেগে অনেকখানি মাসিকে ছাড়িয়ে চলে এসেছিলাম। রিকশা থেকে নেমে, আমরা মাসিকে আর দেখতে পেলাম না। তারপর থেকে মায়ের রিকশা চড়ার দম বেড়ে গেল। মা বেশি-বেশি কোরান আর নামাজ পড়তে লাগলেন। তছবি গুনতে শুরু করলেন। ছোটো ভাই রাজাকে সাথে রাখতেন। নামাজ পড়ে তছবি গুনে রাজাকে কাছে ডেকে মাথায় ফুঁ দিতেন। গায়ে হাত বোলাতেন। মায়ের চোখে জল ভরে আসত। থুতনিতে হাত রেখে রাজার চোখে ভীষণ করুণ করে চাইতেন। এই দৃশ্য মনের ওপর একটা আশ্চর্য ছাপ ফেলেছিল আমার। বুঝতে পারতাম, শিরিন-খালামায়ের জন্য মায়ের বড্ড কষ্ট হয়। কিন্তু সেকথা মুখে প্রকাশ করতে পারেন না। আবার ভাবতাম, এই কষ্টেরই কি কিছু মানে আছে?

একদিন আমাদের শহরের এই বাড়িতে কুন্তল এসে আমায় ডাকলেন। কুন্তলকে মা চেনেন না। বললাম—উনি আমার বন্ধুর দাদা। এই বলে পথে নেমে আসতেই কুন্তল বললেন—খোঁজ পেয়েছি, মিনু। শিরিন ভাকড়ি ছাড়িয়ে ওদিকে একটা বস্তিতে থাকে। একটা পাঠশালা খুলেছে। কী দুরবস্থা কল্পনা করা যায় না। সাদিক কেমন হয়ে গেছে। ঠিকমতন ছেলেপিলে পড়ায় না। পার্টির কাজে মেতে থাকে।

স্টপে এসে বাস ধরলাম আমরা, মিনিট বিশ-পঁচিশ পর বাস ছেড়ে হাঁটা পথ। দুপুরবেলা, গরমও পড়েছে দাউ দাউ। একটা কাঁচা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘর থেকে শিরিন বেরিয়ে এসে মিষ্টি হেসে আমাকে দেখলেন। খুব নরম করে শুধালেন—ভালো আছ?

আমি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' করলাম। কুন্তল বললেন—মোক্তারমামা বলেছেন, মাড়োয়ারির তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতে। লোকটা ফল্‌স্ লোক। তুমি চলে আসার এক মাসের মধ্যে পালিয়েছে। ঐ তালা আখতার হাজী 'ফিট' করেছে। তোমরা না পার, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে আমি ভেঙে ফেলব।

মাসি বললেন—ওই বাড়িতে যেতে আমার পা সরে না।

—পা সরাতে হবে, দরকার হলে, বাড়ি বেচে সেই টাকা কোনো অনাথ আশ্রমে দেবে। তবু দখল রাখবে না, তা হয় না।

কুন্তল গজগজ করতে লাগলেন। মাসি নরম করে বললেন—ঠিক আছে। ও আসুক। বলব।

কুন্তল গলায় জোর দিয়ে বললেন—বলব নয়। শীগগির গিয়ে দখল নিতে

হবে। লড়তে নেমেছ, কোমর সিধে করে থাকো। মামলায় কী হয় দেখে, একটা যা হোক স্থির করব। কিন্তু তার আগেই এই বস্তি ছেড়ে ঐ বাড়িতে যেতে হবে। আমরা দাঁড়াব না। সাদিককে বলবে, আমরা এসেছিলাম। কী মিনু, তোমার কোনো কথা নেই?

বললাম—না। না তো!

মাসি আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুধালেন—তুমি সত্যিই কিছু বলবে না, মিনু?

বললাম—তোমায় মা খুঁজছে খালামা। মায়ের বড়ো কষ্ট।

শিরিন এই কথা শুনেই দ্রুত ভাঙা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে শেকল তুলে দিলেন। কুন্তল কতবার ডাকলেন। মাসি সাড়া দিলেন না। মাসি একদম ছেলেমানুষ। এত শস্তা অভিমান কোথাও দেখিনি।

বাড়ি ফিরতেই মা বারবার আমার আশেপাশে ঘুরতে লাগলেন। শুধালেন—তোর খালা-মায়ের সাথে দেখা হয়েছিল? সাদিক কেমন আছে? কথা বলছিস না কেন?

আমি চুপ করে আছি দেখে বললেন—তুমিও আমাকে বিশ্বাস কর না বুঝি? আমি কি সবখানিই খারাপ, মা? এই বুক কি এতই পাষাণ? তবু চুপ করে আছি দেখে বলে উঠলেন—পেটের মেয়ের কাছেও আজ আমি ছোটো হয়ে গেছি। হায় খুদা! সব আমার পর হয়ে গেল।

বললাম—কোর্টে সবার সাথেই দেখা হবে। এখন খুঁজে কী করবে? আমি অন্য কাজে গিয়েছিলাম।

এগারো

আজ কোর্টে মায়ের সাক্ষী হয়ে গেল। মাকে সাথে করে আমি আদালতে নিয়ে গিয়েছিলাম। মা আদালতে দাঁড়িয়ে কোরান হাতে শপথ করলেন, যা বলবেন, সত্য বলবেন, সত্য বই মিথ্যে বলবেন না। এই কোরান হাতে ছুঁয়ে বাবা লীগের লোকেদের সামনে কসম খেয়ে বলেছেন, শিরিনকে উনি ত্যাগ করেননি। দুনিয়ার কাকপক্ষী তালাক শব্দটি তাঁর মুখে উচ্চারিত হতে শোনেনি। অতএব স্বামী যখন কসম খেয়ে সব অস্বীকার করেছেন, সেখানে স্ত্রী কেন পাপের ভয় করবেন। মা আদ্যোপান্ত সব ঘটনা স্বীকার করলেন, শুধু বললেন, হাজী সাহেব তালাক দিলেও আমি শুনিনি, আমি সে সময় ঘুমিয়ে ছিলাম।...

শিরিনখালামাকে আদালত উকিলের মুখে প্রশ্ন করেছিলেন—হাজীসাহেব

আপনাকে তালাক দিয়েছেন বলছেন, আপনাকে তালাক দিলেন কেন ?

শিরিন বললেন—সেটা হাজীই বলতে পারেন। আমার অপরাধ আমি জানি না।...তখন উকিল প্রশ্ন করলেন—সাদিকুলকে আপনি ভালোবাসতেন, অবৈধ সম্পর্ক গড়েছিলেন, এটা কোনো অপরাধ নয় ? হাজী সাহেবের সাংসারিক মান সম্মান সবই তো খুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর আপনি একরাতে চুপ করে সাদিকুলখানের কাছে শহরে পালিয়ে গেলেন। এই ঘটনা কি মিথ্যা ? সাদিকুলকে প্রশ্ন করা হল—হাজী সাহেবের বাড়িতে আপনি কিসের আকর্ষণে যেতেন ? একটা পর্দানসীন বাড়ি। কুলসম আপনার দূর সম্পর্কের বোন, সেই সূত্র ধরে যেতেন। তাই তো ? তারপর ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। আপনি শিরিন আখতারকে কানে মন্ত্র দিলেন। শহরে পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন, স্বাধীন জীবনের লোভ ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই কিনা ! বলুন ? তারপর উকিল গলা চড়িয়ে 'ইওর অনার' বলে আদালত কাঁপিয়ে বললেন—শিরিন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। কারণ হাজীসাহেবের নামে তাঁর কোন অভিযোগের উল্লেখ আমরা পাচ্ছি না। তাঁর অভিযোগ একটাই, বক্তব্য একটাই, হাজীসাহেব তাঁকে সুস্থ মাথায় সজ্ঞানে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু এই ঘটনার কোনো সাক্ষী ইহলোকে নেই। কেন তালাক দিলেন, তার উপযুক্ত কারণও ফরিয়াদী পক্ষ উপস্থিত করছেন না। এক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায়, উপযুক্ত কোনো কারণ শিরিনের জানা নেই। মুহূর্তের উত্তেজনায়, সামান্য একটা স্বপ্নের তাড়নায় উনি গৃহত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় টিউটোরিয়াল হোমে গিয়ে আপন স্ত্রীর খোঁজ নেওয়া দায়িত্বশীল স্বামীর কাজ বলে মনে করলে অপরাধ হয় না।

ঠিক এই সময়, দেখা গেল, শিরিন কাঠগড়ায় অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। এইদিন আদালত রায় দিলেন না। দিন পনেরো পর আবার আদালত এই মামলার তারিখ ঘোষণা করলেন। মাকে রিকশায় করে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আগাগোড়া বেশ রঙ মিশিয়ে আদালতের এই কাহিনী 'ইসলামী দুনিয়া' পত্রিকায় সবিস্তারে ছাপা হল। লীগের মুখপত্র এই 'ইসলামী দুনিয়া' বাবার পক্ষে এক নির্ভরযোগ্য দোস্ত। প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো-বড়ো হরফে ছেপেছেন, হাজীপত্নী অপহৃতা, মুসলমান যুবকের বেইমানি, সাক্ষী কুলসম বিবি।

পরের দিন ভোরে বাবা মুড়ি চিবোতে-চিবোতে এই উপাখ্যান পাঠ করছিলেন। একটু আগে কোরান পাঠ করছিলেন। আমি ভাকড়ির বস্তির দিকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। মা তছবি গুনে রাজার মাথায় ফুঁ দিচ্ছিলেন।

বস্তির কাছে এসেই চোখ পড়ল বাড়ির সামনে একখানা ঘোড়াগাড়ি। মালপত্র ওঠানো হচ্ছে। কুন্তল আর সাদিকুলকে দেখা যাচ্ছে। একটু পর শিরিন

বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। আমি এগিয়ে গেলাম। ওঁরা আমায় প্রথমে কেউ কোনো কথা বললেন না। গাড়িতে স্বল্প কিছু বাক্সপেঁটরা ওঠানো হলে শিরিন উঠলেন। কুন্তলও উঠে বসলেন। তারপর সাদিকমামা আমার দিকে চেয়ে বললেন—তুমিও ওঠো।...আমি কোনো কথা না বলে নিশ্চুপ গাড়িতে গিয়ে বসলাম। শেষে মামা আমার পাশে এসে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল। মামা বললেন—অনেক দিন তোমায় খুঁজছি। ঢের কথা আছে তোমার সাথে। কোর্টে কথা বলবার ফুরসত হয়নি। আমরা এখন প্রথমে থানায় গিয়ে ডাইরি লেখাব। পরে মাড়োয়ারির ঘরে গিয়ে তালা ভাঙব। সবই কুন্তলের ইচ্ছে। মোক্তারমামার নির্দেশ। আমাদেব মামলাটা গোড়াতেই কাঁচা ছিল। হেরে যাব জানতাম। শিরিনও কোর্টে দাঁড়িয়ে মাথা ঠিক বেখে উপযুক্ত জবাব দিতে পারেনি। তোমার মা যে ওইধারা বলতে পারেন, ও নাকি এখনও সেকথা ভাবতে পারছে না।

কুন্তল পাশে থেকে তেতো করে বললেন—হাজী যে কত বড়ো জল্লাদ সেকথা একবারও শিবিন বলতে পারত. ওকে একদিন মেরেছে পাখার ডাঁটি ভেঙে. সেকথা বলা কি যেত না?

শিরিন বললেন—ওটা কোনো অত্যাচাব নয় কুন্তল। ওব অত্যাচারের আসল চেহারা কেউ দেখেনি।

—তবে সেটা কেন বললেন না?

—সেকথা বলা যায় না, কুন্তল!

—কেন যায় না?

—তুমি ঠিক বুঝবে না। বুবু কোর্টে এসে রিকশা থেকে নেমেই রাজাকে আমার কাছে ইশারায় ঠেলে দিলে, সে-দৃশ্য কেউ তোমরা দেখনি। রাজার মুখ দেখে আমার ভেতরটা কেমন হয়ে গেল, সাদিক।

সাদিক বললেন—কিন্তু তোমার মুখ দেখে বুবুর তো কিছু হল না?

শিরিন আর কোনো কথা বললেন না। কুন্তল বললেন—তুমি চেয়েছিলে বুবু তোমার সব ফয়সালা করে দেবে! দরকার হলে সাদিকের সাথে বিয়ে দিয়ে ফুলশয্যার বিছানা পেতে দেবে। চমৎকার!

গাড়ি এসে থানার কাছে থামল। কুন্তল আর সাদিক নেমে গেলেন। পনেরো মিনিট সময় লাগল ওঁদের। সেই ফাঁকে মাসির সাথে আমার কিছু কথা হয়েছিল। বললাম—তুমি সাদিকমামাকে নিয়ে খেলা করলে, খালামা। বেচারি এখন কী করবেন?

—তুমিও এমনি করে বলছ, মিনু? মাসি অস্ফুট ডুকরে উঠলেন। বললেন—সব দোষ আমারই হল? কোর্ট যে আমার কথা ভালো করে শুনতেও

চায়নি।

ওঁরা ফিরলেন। গাড়িতে উঠে কেউ আর কোনো কথা বললেন না অনেকক্ষণ। কুন্তল একসময় আনমনা বলে উঠলেন—কোর্ট কারো ইমোশন দেখে না। কোর্ট চায় প্রমাণ।

গাড়ি এসে শিরিনের বাড়িতে দাঁড়াল। দরজা খোলা হল। ভেতরে ঢুকলাম আমরা। সাদিক বললেন—আমরা চলে যাব, শিরিন। তোমরা দুজনে মিলে সাজিয়ে-গুছিয়ে নাও। পরে কথা হবে। মিনু, তুমি এখানেই থাকো। বিকালে যেও। আমি বিকালে এসে তোমার সাথে কথা বলব। চলো কুন্তল, আমরা যাই। কুন্তল আর সাদিক চলে গেলেন। ঘর গোছানোই ছিল। বাক্সপেঁটরা থেকে কিছু কাপড়-চোপড় বার করে আলনায় রেখে ফ্যানের হাওয়া ছেড়ে বিছানায় চিত হয়ে পড়ে গেলেন শিরিন। কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে একসময় চোখ খুলে ফ্যানের ঘুরন্ত পাখার দিকে চেয়ে রইলেন। পবে উঠে কুঁজোয় রাখা বাসি জল খেলেন। এবং পরে বাক্স থেকে একখানা ডাইরি বার করে আমায় এগিয়ে দিয়ে বললেন—পড়ো। দিন বিশেক হল, এই ডাইরি আমি আবিষ্কার করেছি। ডাইরিতে সাদিক লিখেছেন :

কোনো-কোনো ছেলের বিবাহিত রমণীর দিকে আকর্ষণ হয় বেশি। বিবাহিতার দেহ এবং মন দুইই খুব ভেতর থেকে টানে। আমি নিজেকে বারবার এই পরীক্ষা করে দেখেছি। কেন এমন হয়, কখনও বুঝতে পারিনি। বারবারই এই মনে হয়েছে, দেহের রহস্যে বিয়ে-হওয়া মেয়েরা কুমারীদের চেয়ে বেশি ভরন্ত, বেশি গভীর। কুমারী মেয়েরা নিজের শরীরকেই ভালোমতো চেনে না। চেনে না বলেই দেহের ভাষা ব্যবহার হয় না তেমন যুৎ-জাত ও সূক্ষ্ম রহস্যলীন। ফলে তাদের মনের মধ্যে থাকে না কোনো সমুদ্র। সেই মন বড়ো জোর একটি লেজ-নাচানো ক্ষুদ্র পাখি। টি-টি। তাই আমি শিরিনকে দুঃসহ ভালোবাসায় উত্তেজিত করতে চেয়েছি ক্রমশ। এর বেশি এই ভালোবাসায় কিছুই ছিল না। নইলে একটি গ্রাম্য মেয়ে আমায় টানবে কেন ? তার অসহায় দুটি চোখের চেয়ে অসহায় শরীরখানি আমার বেশি ভালো লাগত। ভয় হয়, যদি একদিন এই শরীর আমার আর ভালো না লাগে ! কোনো অবস্থায় এই দেহ যদি আর অসহায় না থাকে, আমি সেদিনও কি ঐ দেহে রহস্য খুঁজে পাব ?

পড়তে-পড়তে আমি বার বার চমকে উঠছিলাম। মাথার মধ্যে সব উলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল। আমি মাসির দিকে চেয়ে দেখলাম, মাসি আমার মুখ-পানে দুটি অসহায় বড়ো-বড়ো চোখ মেলে নিষ্পলক চেয়ে আছেন।

ভালোমতন করে তাঁর চোখে চাইতেই উনি গাঢ় স্বরে কেঁপে-কেঁপে উঠলেন—পুরুষের এই মন নিয়ে আমি কী করব বলে দে, মিনু। তুই বলে দে। বলতে-বলতে মাসি বিছানায় ভেঙে পড়লেন। দুহাতে খামচে ধরলেন বিছানার চাদর। উপুড় হয়ে বুকের সাথে কী যেন আঁকড়ে ধরতে গিয়ে পারলেন না। মাথার চুল বিপর্যস্ত হয়ে সামনে ঝুলে পড়ল। চোখে শুকনো কান্নার খিন্ন কালিমার ছাপ ভিজে উঠছে মাত্র কোনোমতে। কণ্ঠস্বরে কী কষ্ট ঝরছে, কী নিষ্ঠুর চাপা খেদ ঘুলিয়ে উঠছে, বোঝাতে পারব না। পাগলের মতন বলছেন :

আহা রে দুলদুলি ঘোড়া
জোর করো থোড়া থোড়া
যেতে হবে টুঙ্গির শহর।

বারো

আমি সাদিকের জন্য বিকাল অবধি অপেক্ষা করিনি। চলে এসেছিলাম। সারা রাত ছটফট করেছি। আমার কষ্ট দেখে মা এসে বিছানার কিনারে বসে ছিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। বারবার শুধিয়ে ছিলেন—কী হয়েছে। আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি। আমার অবস্থা দেখে মায়ের চোখে মুখে আশ্চর্য অপরাধের ছাপ জেগে উঠেছিল। এই ভাবে একটা-একটা দিন কেটে গেল। আগামী কাল রায় বেরুবে আদালতে। আজ এই বাড়িতে আমি একা হয়ে যাব। মা চলে যাবেন গাঁয়ের বাড়ি। বাবাও তৈরি হচ্ছেন মাকে ট্রেনে তুলে দেবেন, তাই। দাড়িতে আতর মাখছেন। কৌটোয় পান সাজিয়ে নিচ্ছেন। চোখে খুশির উজ্জ্বল স্রোত হাওয়ার মতন কাঁপছে। আমি দিনের বেলায় দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠলাম। দেখছিলাম, আমি একটা ছোট্ট টি-টি পাখি আকাশপথে একলা উড়ে যাচ্ছি। অবধিহীন আকাশের পথে আমি বড়ো একা। আমি চিৎকার করে ডেকে যাচ্ছি মানুষকে। ঘুমন্ত নগরী, গাছপালা-প্রান্তর ঘুমিয়ে। কেউ আমার কান্না শুনছে না। বুকের তলায় বুদবুদ করছে ভয়। প্রবল এক ভয়ের তাড়নায় বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে। ভয়েই কেঁদে উঠে জাগলাম। বিকাল হয়ে এসেছিল। হঠাৎ কী মনে করে চোখে মুখে জল দিয়ে চা খেয়ে শাড়ি বদলে বাইরে পথে একলা হাঁটতে শুরু করলাম। মা জানালেন, চলে যাবেন উনি। বাপ-মেয়ে একসাথে থেকো বলে ভালো থাকার শুভেচ্ছা জানালেন। মায়ের চেহারা কী করুণ দেখাচ্ছিল, মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে। বারবার আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। পেছনে চেয়ে

দেখলাম, মায়েরা রিকশা করে স্টেশনের দিকে চলে গেলেন। রাজা আমার নাম ধরে মিনুআপা বলে। রাজা আমায় ডেকে-ডেকে কী বলছিল রিকশায় চড়ে, শুনতে পেলাম না।....

শিরিনের ঘরে গিয়ে উঠলাম। শিরিন দরজা খুলে আমায় ভেতরে ডেকে নিলেন। সন্ধ্যার সময় মনে করলাম, আমি এখানেই থেকে যাব। সেকথা মাসিকে জানালামও। মাসি খুশিই হলেন। সন্ধ্যার আরো কিছু পরে সাদিক এলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে শুধালেন—আমার কথা তো শুনলে না, মিনু।

বললাম—আপনার সব কথা আমি জানি।

—সব জান ? কোথা থেকে ? কে বলেছে ? আমি তো তোমায় যা বলব বলেছিলাম, শুনলে না, না শুনেই কী করে জানলে আমার সব কথা ?

—আপনার ডাইরি পড়েছি সাদিক-মামা।

—ও !

মামা ধীরে-ধীরে উঠে পড়লেন। আমি ওঁর পিছু-পিছু এগিয়ে এলাম বারান্দায়। সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালাম। মামা কয়েক ধাপ নীচে নেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—ওসব কথা আমি নিজের ওপর রাগ করে খুব এক ইমোশনাল সময়ে লিখেছি মিনু। বিশ্বাস করো, আমি যা লিখেছি সেসব আমার মনের কথা নয়। শিরিন কখন ওই ডাইরি চুরি করে [illegible]য় জানতে পারিনি। আরো দু ধাপ নামলেন মামা। আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন—একটি জটিল নারী-জীবনে আমার আকর্ষণ ঠিক কথা। কিন্তু দেহই আমার কাছে সব ছিল না। তুমি শিরিনকে বলবে। বলবে তো ?

দৃঢ় গলায় বললাম—না। কখনও নয়। কক্‌খনও নয়। কিছুতেই না। আমি অত গ্রাম্য নই। তুচ্ছ একটা টি-টি পাখি নই সাদিক মামা।

—তাই বুঝি ?

বলে সাদিকুল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছিলেন। পেছনে, আমার পেছনে এসে মাসি দাঁড়িয়েছেন। সাদিকুল আর উঠলেন না। হো হো করে হেসে উঠে ঘরে গেলেন। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নীচে চলে গেলেন। মাসিও পেছন থেকে সরে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমার সহসা দুই চোখে কান্না এসে দুলতে লাগল। কিছু পর বাইরে বাবার কড়া গলা শোনা গেল। মিনু, নেমে আয়। একলা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। মাসি এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। আকুল হয়ে বললেন—যেও না, মিনু। একলা আমার ভয় করছে।

আমার উপায় ছিল না। বাবার হুকুম। চলে গেলাম নেমে। বাড়িতে এসে

খেয়ে নিয়ে বালিশে মাথা দিতে গিয়ে দেখি তলায় চিঠি। মায়ের লেখা। মাসিকে।

স্নেহের শিরিন/

আদালতে আমি ভুল সাক্ষ্য দিয়েছি, বোন। আমি স্পষ্ট তালাক দিতে শুনেছি হাজী সাহেবকে। আমাকে ক্ষমা করে দিও। তুমি কখনও এই সংসারে ফিরতে চেও না। সাদিকুলকে শাদি করে সুখী হওয়ার চেষ্টা করবে। আমার আশীর্বাদ রইল। সাদিক ভালো ছেলে। ঘরের বউদের সে কেবল ভালোই বাসেনি। শ্রদ্ধাও করেছে। এই চিঠি যদি তোমার কোন ব্যবহারে লাগে, লাগিও। আমার স্নেহ জেনো। ইতি

তোমার বড়ো বোন
কুলসম

সেই এক মারাত্মক চিঠি এখন আমার ব্যাগের মধ্যে। সারারাত ছটফট করেছি এক দিশাহীন উত্তেজনায়। রাত গভীর হয়েছিল। পথে ভয়ে নামতে পারিনি। ভোরের জন্য অপেক্ষা করেছি। অনেক রাতে হঠাৎ দেখেছি, বাবা বিছানায় নেই। সারারাত তোলপাড় হয়েছে আমার। বাবা কোথায় গেলেন?

অন্ধকার থাকতেই বাড়ির গেটে তালা লাগিয়ে পথে নেমে এসেছি। বুকটা আমার অসম্ভব আনন্দে টনটন করছে। রিকশা এখনও ঠিকমতন পথে নামেনি। পায়ে হেঁটে ছুটছিলাম। চৌমাথায় গেলে রিকশা পাওয়া যেত। এতক্ষণে খেয়াল হল। আমি এবার মাঠে নামলাম। আকাশে লালিমা ঈষৎ ফুটেছে। মামার দরজায় টোকা দিলাম। ঘরে হ্যারিকেনের আলোয় মামা পোশাক পরে তৈরি। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। অন্য হাতে অ্যাটাচি। আমায় এখন এই অবস্থায় দেখে আশ্চর্য হলেন। কী ব্যাপার, তুমি?

—বলছি। আগে আমার সাথে খালামার ওখানে চলুন। ওখানে গিয়ে সব বলব। উত্তেজনায় কথা বলতে গিয়ে আমি বোধহয় মৃদু-মৃদু হাঁপাচ্ছিলাম।

মামা বললেন—আমি তো আজ পাটনা চলে যাচ্ছি, মিনু। পার্টি আমাকে পাটনা পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমি যেতে চাইনি। আমি নিজেকেই ঠিক চিনতে পারলাম না।

—আপনি খালামাকে ফেলে চলে যাবেন?

—তোমার খালামা যাবেন কী করে, মিনু? পথ যে বন্ধ হয়ে গেল।

রিকশা এসে গেল দ্রুত। পরে রাস্তায় আমরা রিকশা পেয়েছিলাম, মারাত্মক চিঠিটা এখন আমার হাতের মুঠোয়।

আমরা উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত। দরজা বন্ধ। কলিং বেল বাজল।

একটু বাদে দরজা খুলে গেল। সামনে বাবা দাঁড়িয়ে। হাতে গোঁফ ছাঁটার কাঁচি। আমাদের দেখে ভেতরে পাশের ঘরে চলে গেলেন। খাটে শিরিন। সেদিকে চেয়েই বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। পরনের কাপড় একপায়ে হাঁটু অব্দি উঠে আছে। বুকের ব্লাউজ মেঝেয় পড়ে। ছেঁড়া। বুকের ওপর গলার কাছে কাপড় জড়ো করা। গলায় ছেঁড়া দাগ। গাল নখরে বিক্ষত। ঘুমন্ত কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বোধহয় চোখ তোলারও ক্ষমতা নেই। একটু পর কাতর খুব অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল গলা থেকে। সাদিকুল একটু ঝুঁকলেন। আমিও আরো কাছে এগিয়ে এলাম।

ডাকলাম—খালামা!

কোনো সাড়া পেলাম না। পায়ের দিকে একটু সরে যেতেই খালামা মৃদু নাড়া খেলেন নিজেরই মধ্যে। আমি সাদিকুলের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে দেখলাম, তাবৎ মুখ কেমন সংকুচিত, রেখাময়। থুতনি ঝুলে গেছে।

বাবা এসে হঠাৎ পাযের কাপড় টেনে নামালেন। কোনো কথা বললেন না। আবার পাশের ঘরে গেলেন, আবার এলেন। আমাকে বললেন—আজই আমরা বিকালে বাড়ি চলে যাব। তোমার ছোটোমাকে নিয়ে একসাথে যেতে হবে। তুমি এখন এখানেই থাকো। আবার চলে গেলেন পাশের ঘরে। আমি সেই মারাত্মক চিঠিখানি হাতের মুঠোয় ধরে আছি। সাদিকুল ডাকলেন অস্পষ্ট গলায়—শিরিন! আর একবার! আর একবার তুমি পালিয়ে আসতে পার না?

খালামা চোখ তোলার চেষ্টা করতেই চোখের পাতা থরথর করে কেঁপে গেল। সাদিকুল একটা ঢোঁক গিললেন। তারপর কোনো কথা না বলে সহসা তীরের মতন বেগে ঘর ছেড়ে সিঁড়ি টপকে নেমে গিয়ে রাস্তায় পড়লেন। রিকশায় উঠে পড়লেন। আমি চিৎকার করে সাদিকমামাকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম, গলায় কোন শব্দ ফুটছে না। আমার হাতের মুঠোয় সেই মারাত্মক চিঠি নিঃশব্দে পড়ে রইল প্রতিবাদহীন।

তেরো

সেই থেকে শিরিন-মাসি বিছানায় শুয়ে থাকেন দিনরাত্রির অধিকাংশ মুহূর্ত। তাঁর মনের মধ্যে চিন্তার তরঙ্গ আছড়ে পড়ে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতন। কিন্তু বাইরে সেই ক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সমুদ্রের কোনো পরিচয় ফুটে ওঠে না। শুধু চিন্তারই কিছু ক্ষয় তাঁকে তলে-তলে পিষে ফেলে মানুষের একটি প্রায় সমাহিত আকৃতির মধ্যে জগৎ থেকে নির্বাসিত করে দেয়। একটি রক্তাক্ত জীবনপিণ্ড স্থবির হয়ে

জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে চোখের ওপর, পৃথিবীর হিম-অন্ত্র থেকে একটি মৌন ম্লান ছায়া উঠে এসে তাঁর দেহের চারপাশে জড়িয়ে দেয় এক আশ্চর্য আবরণ। মাসিকে আমি নিজেও যেন ঠিক আর চিনতে পারি না।

মাসির শরীরের নিম্নভাগ অবশ হয়ে এলিয়ে গেছে। হাঁটাচলা করতে গেলে তাবৎ প্রত্যঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠে। দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত মাসি দেওয়াল আঁকড়ে পা টেনে-টেনে চলবার চেষ্টা করেন। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে পারেন না। হাত কেঁপে গেলাস খসে যায়। জল গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। রাজা কাছে এলে সহ্য করতে পারেন না। কোলে উঠতে চাইলে, গায়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও সিঁদুরি গাছে এ বছর অজস্র বউল পুঞ্জিত হয়ে ওঠে।

গোলোকবাবু নল উঁচিয়ে পাম্প মেশিনে মেডিসিন স্প্রে করতে থাকেন। পুঞ্জে-পুঞ্জে অসংখ্য মৌমাছি গুঞ্জন করে। আঠালো মধু ঝরে পড়ে ডালে পাতায়, সবুজ গন্ধে ম-ম করে বাগান। নির্মম সেই সৌন্দর্য মাসি কি সহ্য করতে পারেন? জানালা খুলে দিয়ে মাসিকে দেখানোর চেষ্টা করি—খালামা! কত বউল এসেছে দেখো। একদিন তুমি প্রার্থনা করেছিলে।

অন্ধকার-গোপন পৃথিবীতে মাসির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে। মাসি টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। দেওয়াল ধরে ঘর ছেড়ে বারান্দায় চলে এসে সেই রাতে পায়ে-পায়ে এগোবার চেষ্টা করেন। ক্রুদ্ধ মিয়ানো গলায় শিরিনের রাতভর এক আশ্চর্য যুদ্ধ চলতে থাকে।

আমরা কেউ কিছুই বুঝিনি। দারুণ নিস্তরঙ্গ মাসি মনে-মনে কী দুঃসহ আচরণ করেছেন নিজেরই সাথে। এভাবে উঠে দাঁড়ানো যদিও তাঁর স্বাস্থ্য ও শক্তি বিরুদ্ধ, তবু তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। হাঁটতে পারেন না, তবু হেঁটে এসেছেন সারা ঘর, তাবৎ বারান্দা, সিঁড়ি এবং বাগানের চিকন পথ। তারপর হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। মাথা তুলতে পারেন নি। আমি ওঁর ঘরে গিয়ে তিনি নেই দেখে মাকে ডেকেছি। আব্বা উঠেছেন। খুঁজতে-খুঁজতে বাগানে এসেছি আমরা। দেখি, মাসি মুখ থুবড়ে মাটিতে শুয়ে, চোখে মুখে ধুলো, চুলে লুটিয়ে থাকা ধুলোর ছোপ। মাসি চোখ তুলে আমাদের দিকে পাগলের মতন চাইলেন। ভোর হচ্ছে তখন। রোদের রেখায় পূব-আকাশ ফরসা হচ্ছে। মাসি আমাদের কারুকেই ঠিক যেন আর চিনতে পারছেন না।

হাতে ধরে আছেন সেই চিঠির মারাত্মক টুকরো-খানি। এবং তিনি সারারাত যা-যা করেছেন, তারও স্পষ্ট মানে তাঁর জানা নেই। তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক এই

সকালে আস্তে-আস্তে ফের ঘুমিয়ে গেল। এইভাবে তাঁর সব সত্তা হঠাৎ করে ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাবা ওঁকে কোলে তুলে পাঁজা করে খাটে এনে ফেললেন। মাসি আর চোখ তুললেন না।

তাঁর সেই শ্রান্ত শরীরে, ঘুম-মাখানো অবয়বে পৃথিবীর সবচেয়ে কুটিল ক্রূর অভিশাপ তলপেটে দাপিয়ে নড়ে উঠল : যার সাথে শিরিন মনের সব সংযোগ হারিয়ে এখনও বেঁচে রইলেন, পাগল হতে চেয়েও পারলেন না। এবং মৃত্যুও তাঁব এই শরীরের পক্ষে অনুচিত। সেই ক্ষমতাও হারিয়েছেন শিরিন।

কেবল সিঁদুরি গাছ পৃথিবী আলো করে হাসছে। চোখের সামনে। জানালার ওপারে জীবনের বিপরীত সৌন্দর্য এক হয়ে মিশে গেছে।